সোনামুখী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

SONAMUKHI COLLEGE
Estd.-1966

প্রগতি
২০১৫

Blood Donation

Blood Donation

Blood Donation

Blood Donation

সোনামুখী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

প্রগতি - ২০১৫

আমাদের কলেজের বিগত দিনের
ছাত্র-ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের
অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত
এবং
প্রাকৃতিক বিপর্যয়, গণসংগ্রামে
নিহত শহীদদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে
আমাদের এই প্রয়াস।

পরিচালনায় :- **ছাত্র-সংসদ**

প্রকাশক : **ডঃ বাপ্পাদিত্য মণ্ডল**
টিচার-ইন-চার্জ
সোনামুখী কলেজ,
সোনামুখী, বাঁকুড়া
পিন - ৭২২ ২০৭

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৫

পত্রিকা কমিটি : অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ দাস (তত্ত্বাবধায়ক)
অধ্যাপক মইনুল হক
কাশীনাথ পাঁজা ও পার্থ ঘোষ (যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক)
সৌভিক ঘোষাল ও গৌতম ঘোষ (যুগ্ম পত্রিকা সহ-সম্পাদক)

পত্রিকা সদস্য : সাফিউল্লা মল্লিক
সেখ সাদ্দাম

পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ : প্রশান্ত নন্দী ও প্রদীপ বাড়ুই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অধ্যাপক সুবীর চৌধুরী, অধ্যাপক রাতুল সাহা

পরিচালনায় : ছাত্র-সংসদ

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ : **শ্রীলক্ষ্মী প্রেস (অফসেট)**
রাণীরবাজার, সোনামুখী, বাঁকুড়া।
দূরভাষ - (০৩২৪৪) ২৭৫৬৭১
মোঃ ৯৪৩৪৫২২৬৪২

Tel. : (91)3244-275251
www.sonamukhicollege.org

SONAMUKHI COLLEGE
P.O.- SONAMUKHI ✦ DIST.- BANKURA ✦ PIN - 722 207 (W.B.)

From :-
Dr. Bappaditya Mandal
Teacher-in-Charge &
Associate Prof. of Physics

প্রতিবেদনে —
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

কথার সময়, সময়ের কথারা গোল্লাছুট ও বানভাসী। সময়ের নিরিখে কখনো কখনো দেশ ও দশে অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটছে। আলাপচারিতার বাতাবরণই একমাত্র রসদ জোগাতে পারে সহিষ্ণুতার নতুন মাত্রা দিতে। অনতিঅতীত শারদীয়ার অনপনেয় রূপ-রস-বর্ণ আর হৈমন্তিক শিশির পাতের পরিসরকেই চয়ন করা হয়েছে এই আলাপচারিতার আদর্শ সময় হিসাবে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী, অধ্যাপক ও ছাত্র-সংসদ সকলের মধ্যে নতুন উন্মাদনা – সোনামুখী কলেজের বার্ষিক পত্রিকা **'প্রগতি-২০১৫'** – ওই আলাপচারিতারই বহিঃপ্রকাশ। বিশেষত, ছাত্র-ছাত্রী যারা এই সোনামুখী কলেজের প্রাণ-মন-মনন-মরম – তাদের লেখা, তাদের সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেবার ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে এই বার্ষিক পত্রিকাতে। তারা হয়তো ভবিষ্যতের পরিসরে অনেক সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দেবে নিজস্ব প্রতিভার দ্যুতিতে। যা সুন্দরতর ও আরো সহিষ্ণু সমাজ গঠনের অভিপ্রায়ে বিশেষ পাথেয় হবে। কিন্তু, একথা গর্ব করে বলা যায় যে, তাদের অনেকের-ই প্রথম লেখার, প্রথম সৃষ্টির পীঠস্থান হয়ে উঠবে **'প্রগতি-২০১৫'**।

সোনামুখীর সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প-নন্দনকলায় আরও এক বহুমাত্রিক তাৎপর্য বহন করবে, অতীতের মতোই – এই পত্রিকা। এই পত্রিকা বহুস্বরিক, বহুতাৎপর্যময়, বহু সুরমূর্ছনায়, অনেকান্তিক দ্যোতনায় দ্যোতিত হয়ে উঠুক আগামী দিনে – এই প্রত্যাশা আন্তরিকভাবে কামনা করি।

(Bappaditya Mandal)
Teacher-in-Charge
Sonamukhi College
Sonamukhi, Bankura

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও বহু উদ্দীপনার সাথে সাথে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি সরিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায় প্রকাশ করা হোল আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয় ও উন্নয়নের সাথী **'প্রগতি'** পত্রিকা।

একদিকে যখন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চলছে, চলছে কালো টাকা উদ্ধারের নাম করে বিদেশ ভ্রমণের কথার, অন্য দিকে গরীব দরিদ্র অবহেলিত মানুষের উপর আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

অন্যদিকে আবার উস্কানির শিকার প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা, চুম্বনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির গর্বের বাংলাকে কালিমালিপ্ত করেছে। এটা কখনোই শিক্ষার হাল হতে পারে না, প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না।

তাই আমরা চাই শিক্ষার প্রসার হোক সঠিকভাবে। সম্মান দেওয়া হোক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে, স্বামী বিবেকানন্দকে, বিনয়-বাদল-দিনেশ-কে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সেই সমস্ত স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে সমাজ থেকে, সভ্যতার আঙিনায় প্রবেশ করতে দেওয়া চলবে না।

চাই কৃষি, শিল্প, শিক্ষার বিস্তার প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যন্ত। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, মানুষের মত মানুষ হতে হবে।

আজ খুবই ভালো লাগছে, কন্যাশ্রী প্রকল্পর জন্য। যেখানে দরিদ্র ঘরের ছাত্রীরা কলেজে পড়াশোনা করে এককালীন ২৫০০০ টাকা পেয়ে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে। সঙ্গে রয়েছে যুবশ্রী ও শিক্ষাশ্রী প্রকল্প।

আমার অবহেলিত জেলা বাঁকুড়ায় দীর্ঘদিন পরে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি।

জলের অপর নাম জীবন, জল না খেলে মানুষ বাঁচতে পারে না। আজ জলের চাহিদা মেটাতে আমরা বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জল প্রকল্প পেয়েছি সারা জেলা জুড়ে। তাই আমি একটা কথা বলতে পারি – "আজ বাংলা যা ভাবছে আগামী দিন তা সারা ভারত ভাববে।" সকলকে আমি ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই **'প্রগতি'** পত্রিকার মাধ্যমে।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ

অতনু গরাই

সাধারণ সম্পাদক

ক্রীড়া সম্পাদকের প্রতিবেদন

কিছুদিন আগে পেরিয়ে যাওয়া শারদোৎসব ও দীপাবলীর মধুর স্মৃতি এখনও আমাদের মনে অবশেষে প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও প্রকাশিত হল আমাদের কলেজের সকলের প্রিয় বাৎসরিক পত্রিকা **'প্রগতি ২০১৫'**। শারদোৎসব ও দীপাবলীর মধ্যবর্তীকালে কাশ, শিউলি পথে শুভ্র আঁচল বিছিয়ে লক্ষ্মীদেবীকে বরণ করে নিয়েছি, ঠিক সেই রকম আমাদের প্রিয় পত্রিকা **'প্রগতি'** কলেজের সকলের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত।

পশ্চিমবাংলার জনগণ এক সুন্দর, সাধারণের মা, মাটি, মানুষের সরকারকে এনে দিয়েছে। সে সরকার মাত্র কয়েক মাসেই শিক্ষা, খেলাধূলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যকে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে। যা বিশ্ববাসীর কাছে দেশের সম্মান বাড়িয়েছে।

যদিও বর্তমান শতাব্দীতে খেলাধূলা পেশাদারিত্বের কবলে পড়ে কিছুটা পিছিয়ে তবুও আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে খেলাধূলার মানকে উন্নয়নমুখী করা।

প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও আমরা ছাত্র-সংসদ কলেজের খেলাধূলার মান উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টান্ত রেখেছি। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাথে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথে পরিচালিত হয়েছিল। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীবৃন্দের সহযোগিতায় সর্বাত্মক সফল ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছিল প্রচুর ইভেন্ট, সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের জন্য ছিল বেশ কিছু আকর্ষণীয় ইভেন্ট। এ বছরও আমাদের কলেজ নিষ্ঠার সঙ্গে কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। সেখানে শেষমেষ পরাজিত হলেও তারা খুব ভালো খেলেছিল। এছাড়া এ বৎসর অন্তঃবিভাগের ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় ছিল ছাত্রছাত্রী উভয়ের ক্যারাম প্রতিযোগিতা। যা সত্যই ছিল আকর্ষণীয়।

বর্তমানে খেলাধূলার মান উন্নয়ন করতে হলে আমাদের সকল স্তরের মানুষকে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। খেলাধূলার পাশাপাশি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের মান উন্নয়ন করতে সকলকে প্রয়াসী হতে হবে। যাই হোক, এখানে আমার কলম সমাপ্ত করলাম। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম্।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ

যুগ্ম সম্পাদক - **অতনু দুয়ারী ও প্রশান্ত সাহা**

যুগ্ম সহ-সম্পাদক - **পথিক ডাঙ্গর, সাজাহান সেখ ও মানস কুমার ভান্ডারী**

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি সম্পাদকের প্রতিবেদন

প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অবশেষে প্রকাশিত হল আমাদের প্রত্যেকেরই বহু আশাদীপ্ত কলেজ পত্রিকা ' প্রগতি - ২০১৫'। সেবাই হল পরম ধর্ম। শিব জ্ঞানে জীব সেবাই পরম তৃপ্তি। বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমরা ছাত্র-সংসদদের তহবিল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। আমাদের কলেজে পড়তে আসা বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী কৃষিজীবি খেতমজুর গরীব পরিবারের। সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও ফর্ম ফিলাপের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকে না। গত বৎসরের মতো এবৎসরও আমরা ভর্তি ও ফর্ম ফিলাপের সময় ৮০,০০০ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের AID FUND দিয়ে সাহায্য করেছি।

দিবা বিভাগ	–	৪১,৯০০ টাকা।
প্রাতঃ বিভাগ	–	৩৮,১০০ টাকা।
মোট	–	৮০,০০০ টাকা।

এছাড়া গত বৎসরের মতো এবারেও দিবা বিভাগে ৫৯৫ জন ও প্রাতঃবিভাগে ৫২০ জনকে কলেজে অর্ধবেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে একই রকম ভাবে ও আরো ভালোভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে ও সাথে থাকতে পারি এবং তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি এবং সোনামুখী কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি সেজন্য গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের একনিষ্ঠ সমর্থন আমাদের পরিচালিত ছাত্র-সংসদের উপরে থাকবে এই আশা রাখি।

পরিশেষে পত্রিকার মাধ্যমে কলেজের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনার সাথে সাথে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ

দীপক দাস, পার্থ সরকার
জয় রক্ষিত, জ্যোতির্ময় ব্যানার্জ্জী
(প্রাতঃবিভাগ)

বসিরুদ্দিন সেখ, দীপক কুমার খাঁ
অরিন্দম পাল, অভিজিৎ জোয়ারদার
(দিবাবিভাগ)

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের প্রতিবেদন

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখার শুরুতেই প্রথমেই জানাই আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সকলকে। আমরা খুশি 'প্রগতি' পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পেরে।

'সাংস্কৃতিক' বিষয়টি খুবই জটিল। সংস্কৃতি অর্থাৎ Culture সঙ্গীত হতে পারে, নৃত্য হতে পারে, কলালৌশল বা মেধা হতে পারে। তাই বিষয়টি আমাদের কাছে যথেষ্ট যত্নের ও সম্মানের।

আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি। এছাড়া কলেজে আমরা সরস্বতী পূজা, ১৫ই আগস্ট, ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী, ৫ই সেপ্টেম্বর গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করি। সকল ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত থেকে আমাদের সহযোগিতা করে।

প্রত্যেকবার আমরা নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করে নেওয়ার জন্য নবীন-প্রবীণ মিলন উৎসব পালন করি। যা কলেজের মানকে অনেকখানি বৃদ্ধি করে। প্রবীণ থেকে নবীন, গ্রাম থেকে শহর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান মাতিয়ে দেয়।

প্রত্যেক বছর স্পোর্টস এবং গেমস্-এ কলেজ পার্শ্ববর্তী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় যা খুবই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। এবং পরিশেষে আমরা একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। তাতে বিভিন্ন চলচ্চিত্র খ্যাতনামা শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ২০১৫-র এই বৎসরও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চলচ্চিত্রের হাস্যকৌতুক বিখ্যাত অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক ও গায়িকা।

পরিশেষে বলি সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সংস্কৃতি আমাদের গর্ব, সংস্কৃতি আমাদের অহংকার, আমাদের গৌরব, সুতরাং কৃষ্টি, সংস্কৃতির হাত ধরে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন হবেই – এই আশা রাখে ছাত্রসমাজ।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ

যুগ্ম সম্পাদক - **কুন্তল ঘোষ ও রুমকী দত্ত**

যুগ্ম সহ-সম্পাদক - **জয়প্রকাশ ব্যানার্জী ও সাগর মুখার্জী**

পত্রিকা সম্পাদকের প্রতিবেদন

সুধী,

পত্রিকা সম্পাদকীয় কলমে লিখতে গিয়ে বার বার তাদের ছবি ভেসে ওঠে যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই। প্রিয়জনদের হারানো অব্যক্ত কোনো ব্যথার চেয়েও ব্যথাতুর ও হৃদয়বিদারী। পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ সন্ত্রাসের ত্রাসে চলে গিয়েছে। তাপসী মালিক, সুজাতা দাস, দেবযানীর রক্ত যেন আজও তাজা। নন্দীগ্রামের গণহত্যার কর্ণবিদারী চিৎকার আজও বাংলার সমস্ত আকাশে বাতাসে। তাদের বিচারের বাণী আজও নীরবে কাঁদে। যারা চলে গেছে মৃত্যুর কোলে, যাদের আর ফিরে পাব না তাদের অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

এরপর সোনামুখী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ভাইবোন, দাদা-দিদি, সহপাঠী ও প্রতিটি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে জানাই শুভেচ্ছা ও জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন। বিগত বৎসরের মতো এ বৎসরও আমাদের কলেজের বহু আকাঙ্ক্ষিত বার্ষিক পত্রিকা **'প্রগতি ২০১৫'** নিয়ে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মনে জায়গা করে নিয়ে এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছি। অতীতে অনেকের সহযোগিতা ও সহমর্মিতাকে পাথেয় করে সাফল্য লাভ করেছি, এবারও তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে আমরা চেষ্টাবান। কলেজ পত্রিকা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অন্যতম কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বহু সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে কলেজের এই পত্রিকার মাধ্যমে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের নিজ নিজ ভাবনা লেখনীর মাধ্যমে এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়। যাতে তাদের ভবিষ্যতের কবি, সাহিত্যিক ও উজ্জ্বল প্রতিভার পূর্বাভাষের বার্তার বাহক হয়ে ওঠে। যাদের সুন্দর লেখা কলেজের এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদেরকে অকপটে লেখকের আসনে স্বীকার করা শ্রেয়। কবিতার সাথে সাথে প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি সাহিত্যের নানা সম্ভারের মহামিলন ক্ষেত্র হল এই কলেজ পত্রিকা। এই কলেজের পত্রিকা আমাদের কাছে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সংযত হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। তাই অনেক লেখাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণদের বাতিলের খাতায় ফেলতে হয়েছে, যার জন্য আমরা ছাত্র-সংসদের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী।

কলেজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যসূত্র হল এই বার্ষিক পত্রিকা। ছাত্র-ছাত্রীদের বহু আকাঙ্ক্ষা থাকে এই পত্রিকার উপর। যার মাধ্যমে তারা বৎসরান্তে সংসদের নেতৃত্বে কলেজের উন্নয়নমূলক

সুসংবাদ জানাতে পারে। এই পত্রিকা থেকেই বোঝা যাবে যে কলেজ কোন সত্য সুন্দরের চর্চা করছে; আলোকের কোন দিশায় সঠিকপথে পরিণতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। যা কলেজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহন করবে। কিছু ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তারা মনে করেন – যে দল ছাত্র-সংসদের ভূমিকায় থাকে তাদের প্রচার পুস্তিকা হল এই পত্রিকা। কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভুল। আমাদের এই পত্রিকাতে দলাদলির কোন ভূমিকা নেই। কলেজের প্রতিটি সদস্যের এ পত্রিকায় অবাধ স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও সম্মান একাকার। যা আমরা সানন্দে নিয়েছি যা ধ্রুব সত্য। আপনারা পত্রিকা প্রকাশের যে গুরুদায়িত্ব আমাদের দিয়েছিলেন তা কতটা পালন করতে পেরেছি তার বিচার করার দায়িত্ব আপনাদের হাতেই দিলাম। পত্রিকায় যদি কোন ত্রুটি থাকে তার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরিশেষে কলেজের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ

যুগ্ম সম্পাদক - **কাশীনাথ পাঁজা ও পার্থ ঘোষ**

যুগ্ম সহ-সম্পাদক - **সৌভিক ঘোষাল ও গৌতম ঘোষ**

।। সোনামুখী কলেজ পরিচালন সমিতি ।।

১)	মাননীয় শ্রী অরূপ চক্রবর্ত্তী *(সভাধিপতি, জেলা পরিষদ, বাঁকুড়া)*	সভাপতি
২)	মাননীয় ডঃ বাপ্পাদিত্য মণ্ডল *(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)*	সম্পাদক
৩)	মাননীয় শ্রী মিহির কুমার মুখার্জ্জী	রাজ্য সরকারী প্রতিনিধি
৪)	মাননীয় ডঃ সেখ সিরাজুদ্দিন	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি
৫)	মাননীয় অধ্যাপক বৈবস্বত ভট্টাচার্য্য	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি
৬)	মাননীয়া অধ্যাপিকা কল্পনা মিত্র	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি
৭)	মাননীয় ডঃ স্বপন কুমার সামন্ত	শিক্ষক প্রতিনিধি
৮)	মাননীয় ডঃ পার্থসারথি দে	শিক্ষক প্রতিনিধি
৯)	মাননীয় শ্রী নিখিল কুমার দে	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
১০)	মাননীয় শ্রী দেবাশীষ বিশ্বাস	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
১১)	শ্রী অতনু গরাই	সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-সংসদ

LIST OF COLLEGE STAFF

TEACHER-IN-CHARGE

Dr. Bappaditya Mandal *M.Sc., Ph.D.*

TEACHING STAFF (DAY SHIFT)

DEPTT. OF BENGALI

1. Dr. Asrafi Khatun	*M.A., B.Ed., Ph.D.*	Asstt. Professor (on lien)
2. Sk. Moinul Haque	*M.A.*	,,
3. Dr. Sumana Sannyal	*M.A., Ph.D.*	,,
4. Dr. Amar Patra	*M.A., Ph.D.*	,,

DEPTT. OF ENGLISH

1. Dr. Dharmadas Banerjee	*M.A., Ph.D.*	Associate Professor
2. Sri Indranath Mukherjee	*M.A.*	Part-time Teacher
3. Sri Salil Bhuin	*M.A.*	,,

DEPTT. OF SANSKRIT

1. Dr. Sadhan Kumar Patra	*M.A., Ph.D.*	Asstt. Professor
2. Sri Kajal Pal	*M.A.*	Part-time Teacher
3. Smt. Purnima Shit	*M.A.*	,,
4. Sri Achintya Adhikari	*M.A.*	,,

DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE

1. Sri Indarjit Das	*M.A.*	Associate Professor
2. Sri Dipak Kumar Neogi	*M.A., B.Ed.*	,,
3. Smt. Swagata Chakraborty	*M.A.*	Part-time Teacher

DEPTT. OF PHILOSOPHY

1. Smt. Sudhamoyee Kumar	*M.A., M.Phil., B.Lib.Sc.*	Asstt. Professor
2. Sri Ashok Dhani	*M.A., B.Ed.*	Part-time Teacher

DEPTT. OF HISTORY

1. Sri Asim Konar	*M.A., B.Ed.*	Part-time Teacher
2. Sri Ashoke Ghosh	*M.A., B.Ed., M.Ed.*	Part-time Teacher
3. Smt. Sreema Pal	*M.A., B.Ed.*	Contractual Teacher

DEPTT. OF ECONOMICS

1. Sri Ratul Saha	*M.A., B.Ed.*	Assistant Professor

*** DEPTT. OF COMMERCE**

1. Dr. Swapan Kumar Samanta	*M.Com., B.Lib.Sc.,Ph.D.*	Associate Professor
2. Dr. Subir Kumar Chowdhury	*M.Com., Ph.D.*	Assistant Professor
3. Dr. Arun Kumar Roy	*M.Com., M.Phil., Ph.D.*	Associate Professor *(on lien)*

*** DEPTT. OF PHYSICS**

1. Dr. Saikat Dalui	*M.Sc,. Ph.D.*	Assistant Professor

*** DEPTT. OF CHEMISTRY**

1. Dr. Sadhan Kumar Roy	*M.Sc,. Ph.D.*	Assistant Professor
2. Dr. Jnanojjal Chanda	*M.Sc,. Ph.D.*	Assistant Professor

*** DEPTT. OF BOTANY**

1. Dr. Parthasarathi De	*M.Sc., Ph.D.*	Associate Professor
2. Dr. Dipak Kumar Hens	*M.Sc., Ph.D.*	Assistant Professor
3. Dr. Sunita Mukhopadhyay	*M.Sc., M.Tech., Ph.D.*	,,

*** DEPTT. OF ZOOLOGY**

1. Dr. Subhra Kanti Sinha	*M.Sc., Ph.D.*	Assistant Professor
2. Dr. Subhasree Majumdar	*M.Sc.*	Assistant Professor
3. Sri Biplab Banerjee	*M.Sc.*	G.L.I.
4. Smt. Sumana Kaviraj	*M.Sc., B.Ed.*	Part-time Teacher

*** DEPTT. OF MATHEMATICS**

1. Sri Joydeb Mondal	*M.Sc.*	Associate Professor
2. Sri Subhendu Ruidas	*M.Sc.*	Assistant Professor

*** DEPTT. OF GEOGRAPHY**

1. Sri Susanta Chand	*M.A.*	Part-Time Teacher

NON-TEACHING STAFF (DAY SHIFT)

*** Ministerial Staff :**

1.	Sri Debabrata Chatterjee	–	Head Clerk
2.	Sri Partha Sarathi Roy	–	Accountant
3.	Sri Rabisankar Siddhanta	–	Cashier
4.	Sri Haradhan Dey	–	Lab. Inst. (Non-grad.)
5.	Sri Nikhil Dey	–	Clerk
6.	Anisur Rahaman Mondal	–	,,
7.	Sri Santimoy Laha	–	,,

* **Class IV Staff :**

1.	Sri Mrityunjoy Mukherjee	–	
2.	Sri Debasis Biswas	–	
3.	Sri Pronay Sarkar	–	Lib. Peon
4.	Sri Nepal Dutta	–	Lab. Attendent
5.	Smt. Kunti Dom	–	Sweeper
6.	Smt. Lilabati Bhattacharya	–	Lab. Attendent
7.	Sri Pradip Nag	–	Guard
8.	Sri Lakshmikanta Mandi	–	Lab. Attendent

TEACHING STAFF (MORNING SHIFT)

1. Smt. Suchandra Chatterjee	*M.A.*	Contractual Teacher	(Philosophy)
2. Sri Madhab Kundu	*M.A.*	Contractual Teacher	(History)
3. Sk. Mokbul Hoque	*M.A.*	Contractual Teacher	(Bengali)
4. Smt. Tanima Mohanta	*M.A.*	Contractual Teacher	(Bengali)
5. Sri Manojit Ghosh	*M.A.*	Contractual Teacher	(History)

NON-TEACHING STAFF (MORNING SHIFT)

1.	Sri Mohan Chandra Dutta	–	Typist
2.	Sri Ananda Das	–	Lib. Clerk
3.	Smt. Bony Roy	–	Lib. Peon
4.	Sri Madan Ram Jadav	–	Peon
5.	Sri Swapan Ankure	–	Peon

কবিতার নাম / লেখক-লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা নং
সোনামুখী কলেজের ৫০তম বর্ষে পদার্পণে স্মৃতি তর্পণে/এস.এন.কুমার	১
জন্মভূমির ডাক / অভিজিৎ দাস	২
গ্রাম থেকে দূরে / রাজকুমার লোহার	৪
তুমি এলে তাই / বাপ্পা মাজি	৪
তোমাকে দেখার পরে / লোকনাথ লাহা	৫
আমার প্রশ্ন / মুনমুন ধাড়া	৫
কবিতা / সাহানা খাতুন	৬
শুধু তুমি / দেবিকা দে	৬
ফেসবুক / রবিয়াল মণ্ডল	৭
দুঃখ দিও না / সৌরভ মণ্ডল	৭
What The Mind Is? / Uma Karmakar	৮
মা / দিব্যা প্যাটেল	৮
তুমি নেই / প্রদীপ বাড়ুই	১০
আগমনী / কাশিনাথ পাঁজা	১০
ভালোবাসায় এত কষ্ট / অতনু গরাই	১১
নতুন করে বাঁচতে শেখা / হামিরুদ্দিন মিদ্যা	১২
রক্তদান / সুজয় কুমার মোদক	১২
আগামী পৃথিবীর জন্য / মধুমিতা ধাড়া	১৩
ছোট্ট আশা / লাবণী পরামাণিক	১৪
Students / Siddheswar Nag	১৪
আমার মা / নৃপেন লোহার	১৬
হ্যাবিট / কৌশিকী নাগ	১৬
প্রেম এখন / ডালিয়া খাতুন	১৭
রাতের কথা / মহঃ ফারুকুল মিদ্যা	১৭
মা / শুভঙ্কর বড়ু	১৮
অন্ধকার রাত / শান্তনু দে	১৮
কল্পনার ভালোবাসা / অনীষা ব্যানার্জী	১৯
গরীবের কান্না / নন্তু ঘোষ	২০
গ্লোবাল ওয়ার্মিং / চন্দন ঘোষ	২০
একাকী অরণ্যে / সন্দীপ ভুঁই	২২
গাছ কেটো না / চিন্ময় বৈদ্য	২৩
এখনো ভালোবাসি তোমায় / অতনু গরাই	২৩

কবিতার নাম / লেখক-লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা নং
ফুল / রুমা মণ্ডল	২৪
লেখাপড়া / রমা রায়	২৪
ইচ্ছে করে / কৃষ্ণা পাল	২৫
আমরা দু'জন / মাম্পি সিকদার	২৫
জানি আমি / সুদেষ্ণা বিশ্বাস	২৬
বন্ধু / অমৃতা রায়	২৭
বাংলার ই সম্মান / সামিমা খাতুন	২৮
বিরহ / চন্দন ঘোষ	২৮
জিজ্ঞাসা / শুচিস্মিতা কর্মকার	২৯
তোমায় ভালোবাসি / মন্দিরা ঘোষ	২৯
আমরা সবাই ভাই / নির্ময় ঘোষ	৩০
Likes & Dislikes / Abir Mondal	৩০
বই আমার বন্ধু / ঝর্ণা ঘোষ	৩১
হারিয়ে গেছে / মহাদেব মণ্ডল	৩১
হিন্দু আর মুসলমান / সন্দীপ ভুঁই	৩২
মরা পাথরের বুকে / কুতুব উদ্দিন মণ্ডল	৩৪
পুজোর চিঠি / শর্মিষ্ঠা আচার্য	৩৪
আমার জন্মভূমি / বিশ্বজিৎ ওঝা	৩৫
মা / কিটু ঘোষ	৩৫
নিরাশা-র পৃথিবী / অপর্ণা সূত্রধর	৩৬

গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ-এর নাম / লেখক-লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা নং
মা / মহাদেব ঘোষ	৩৭
নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভর দল / অধ্যাপক রাতুল সাহা	৪০
ঝন্টিপাহাড়ীতে ঝঞ্ঝাট / অয়ন দাস	৪৫
যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা / সৈকত মণ্ডল	৪৯
ডাইনি / পূর্ণেন্দু পাল	৫১
Students and the Present Education System in our State/Dr. D. Banerjee	৫৩
হঠাৎ আর্তনাদ / নুরতাজ খাতুন	৫৫
স্বার্থের জালে আবদ্ধ মানুষ / প্রিয়া মণ্ডল	৫৭
আমি দোষী / অতনু দুয়ারী	৫৮
বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস / অধ্যাপক সেখ মইনুল হক	৫৯
রেনসাঁস / সুতপা দে	৬৩
আমাদের কলেজ : আমার অনুভূতি / আজমিরা খাতুন	৬৪
অদৃশ্য / সুস্মিতা কর্মকার	৬৬
এন.সি.সি.-র প্রশিক্ষণ : ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় / অধ্যাপক রাতুল সাহা	৬৮

পৃষ্ঠা নং

..... ২৪
..... ২৪
..... ২৫
..... ২৫
..... ২৬
..... ২৭
..... ২৮
..... ২৮
..... ২৯
..... ২৯
..... ৩০
..... ৩০
..... ৩১
..... ৩১
..... ৩২
..... ৩৪
..... ৩৪
..... ৩৫
..... ৩৫
..... ৩৬

পৃষ্ঠা নং

..... ৩৭
..... ৪০
..... ৪৫
ত মণ্ডল ৪৯
..... ৫১
Banerjee ৫৩
..... ৫৫
..... ৫৭
..... ৫৮
..... ৫৯
..... ৬৩
..... ৬৪
..... ৬৬
রাতুল সাহা ৬৮

Fresher's Day 2015
Ashis Bandyopadhyay
Hon'le Minister (W.B.)

Fresher's Day 2015
Smt. Dipali Saha
Hon'ble M.L.A. (Sonamukhi)

Prize Distribution Ceremony by State Govt. (Nazrul Mancha) 2015

Subarna Jayanti Utsav

Saraswati Puja

Subarna Jayanti Utsav

সোনামুখী কলেজের ৫০তম বর্ষে পদার্পণে স্মৃতি তর্পণে

—এস.এম. কুমার
(প্রাক্তন অধ্যাপক : গণিত বিভাগ)

ভেবেছিলেম আজি বলিব কত কথা,
জানাব তেত্রিশ বছরের মনের গভীর ব্যথা।
আমি অনাগত এ সাত্ত্বিক পুরোধা হয়ে,
এসেছিলেম বিবেক-বাণীর ঝাঁপি হাতে লয়ে।
অতীতে কর্মজীবনে বলতে চেয়েছিলেম বিবেক-ভাবনা,
কলেজ প্রান্তরে চালিয়েছিলেম ক্যাসেট শোনাতে অব্যক্ত যন্ত্রণা।
আজি শ্রাবণের গুমোট দিনে মনে ছিল ঝড়ের আভাস,
হঠাৎ মেঘা এসে বর্ষণকে ডেকে, এনে দিল সুমিষ্ট বাতাস।
বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি -- সুরের মাধুর্যে ভরল মনটা,
ভাবলাম এখনও হয়নি সময় উত্তপ্ত করিতে এই ক্ষণটা।
বিবেকানন্দের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা ভ্রমণে,
কত কিছু করার ভাবনা এসেছিল ধ্যানযুক্ত মনে।
পরে ধ্যান নেত্রে দেখেন সময় হয়নি কাটাতে সব মলিন,
গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মহা সমাধিতে তাই হলেন বিলীন।
বিবেক সজাগ করিবার তরে, আহ্বান করি সত্য পালনে,
বলি, তা নাহলে হয়তো একদিন সব যাবে মহাকাল টানে।
অবশেষে মহাকালেশ্বরকে জানাই সুরক্ষার আহ্বান –
"দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য উদার হে নাথ, দাও দাও প্রাণ, হে সর্ব শক্তিমান।"

দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য, হে উদারনাথ
দাও দাও প্রাণ, অমৃত মৃতজনে
দাও ভীত চিত্ত জনে শক্তি অপরিমাণ
হে সর্বশক্তিমান।।

দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু
স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু
দাও চিত্ত অনিরুদ্ধ দাও শুদ্ধ জ্ঞান
হে সর্বশক্তিমান।।

দাও দেহে দিব্য কান্তি
দাও গেহে নিত্য শান্তি
দাও পূর্ণ প্রেম ও ভক্তি মঙ্গল কল্যাণ
হে সর্বশক্তিমান।।

বিধি নিষেধের উর্দ্ধে স্থির
রহি যেন চির উন্নত শির
যাহা চাই যেন জয় করে পাই
গ্রহণ না করি দান
হে সর্বশক্তিমান।।

"প্রভু এদের তুমি ক্ষমা করো, এরা জানেনা এরা কি করছে।"
– মহান অবতার ক্রুশবিদ্ধ যীশু খৃষ্ট।

জন্মভূমির ডাক

— অভিজিৎ দাস
(সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা, ২য় বর্ষ)

বৃষ্টি ভেজা ভেজা পায়,
আলতো হাতের ছোঁয়ায়।
কেউ যেন এই মনের মেঝেয়,
বারে বারে শিহরণ জাগায়।
তারে দেখিতে নাহি পাই,
সে যেন পাখির সুরে কিছু বলে যায়।
সচকিত মন তবু করে আলোড়ন,
মনে হয় বাতাস কপাল করে চুম্বন।
মনের কোণে লুকিয়ে, এ হেন তাড়নায়
জন্মভূমি মায়ের কথা মনে পড়ে যায়।
বছর দশেক পরে পুরানো স্মৃতির টানে,
বিদেশ ছেড়ে, আমার দেশে ফিরে।
পার হতে যায় নদী সে ধুইয়ে দেয় পা,
চরের ঐ বালি মোছায় আমার পা।
কোকিল কুহু ডাকে; যেন বলে, স্বাগতম্,
গাছের ফুল ঝরে করে আমায় বরণ।
একটুখানি এগিয়ে দেখি ফসল ভরা মাঠ,
ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক, সারি সারি গাছ।
মনে হয় পেয়েছি ফিরে আমার ছেলেবেলা,
জীবনে আসবে ফিরে দুঃখ-সুখের মেলা।
জন্মভূমি মা যেন আমায় নিয়েছে কোলে তুলে,
সারাটি জীবন কাটিয়ে দেব সব দুঃখ ভুলে।

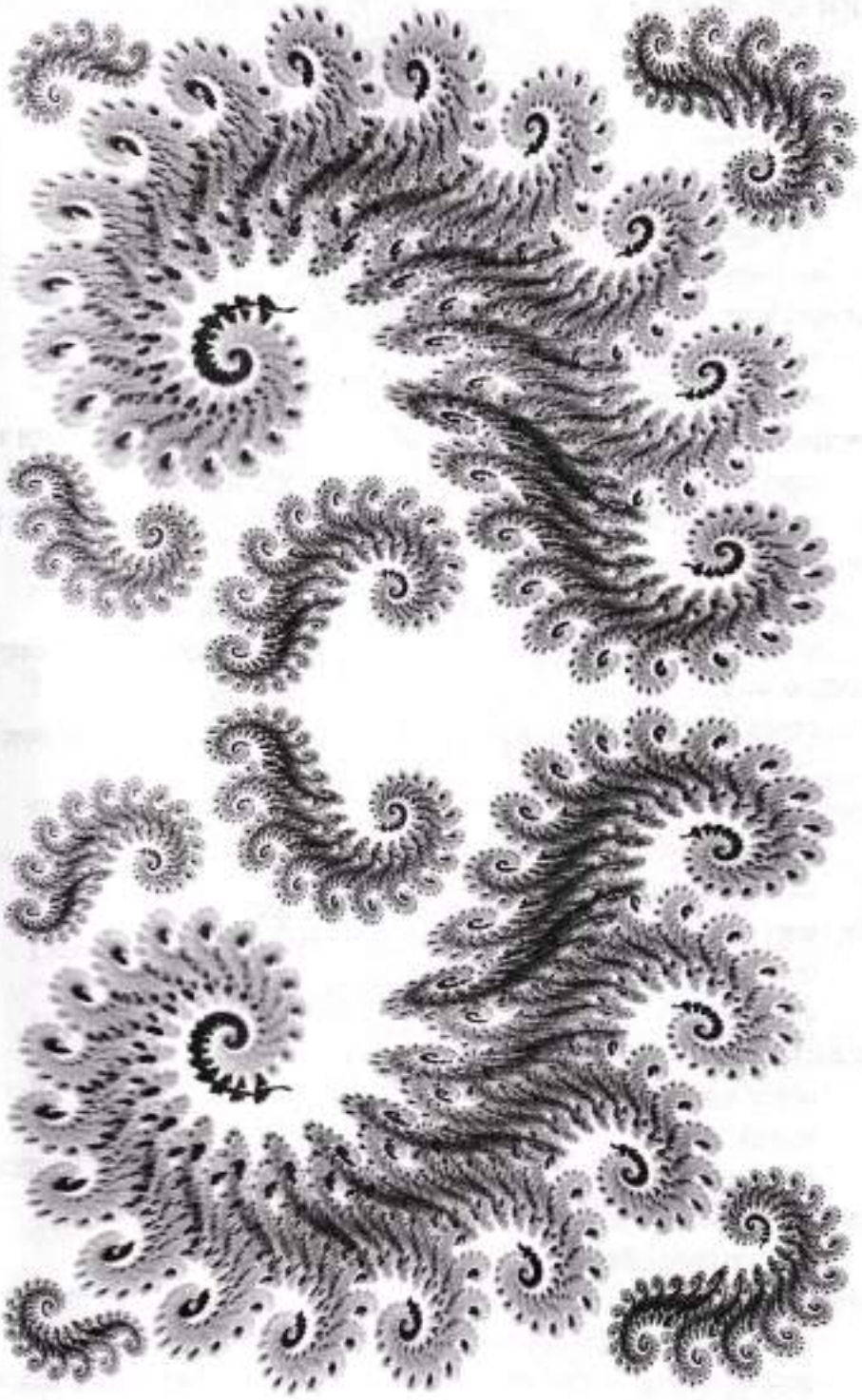

গ্রাম থেকে দূরে

— রাজ কুমার লোহার
(সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যা)

গ্রামকে ছেড়ে এসে
ভেবেছিলাম থাকবো সুখে
শহর পরিবেশে।
যেই না শহরে আসা
হারিয়ে গেল সবুজ মেলা
পাখপাখালির বাসা।
আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটে
যায়না দেখা চাঁদের শোভা;
তারার রাজ্য পাটে।
নৌকো-ডিঙি মাঝি
হেথায় শুধু গল্প কথা
বৃথাই ওদের খুঁজি।
গান এখানেও আছে
কোথায় টুসু, ভাদু, বাউল
কে গায় – ঝুমুর, ধাঁচে।
ঘুমপাড়ানি গান
স্বপ্ন হয়ে যায় মিলিয়ে
মন করে আনচান।
পালকি, গোরুর গাড়ি
যায় না দেখা ইচ্ছে হলেও
মটর সারি সারি।
ধাক্কা আদে ঠিকই
নেই ঝুলিতে দৈত্য-দানব
শহর হল একি?
শুধু হট্টগোল
কোথায় সোহাগ, কাকা-জ্যাঠার
কাকী-জ্যেঠিমার কোল।
চাকরি সুখে থাকা
গাড়ি বাড়ি সবই আছে
মনটা শুধু ফাঁকা।।

তুমি এলে তাই

— বর্ষা মাজি
(প্রাক্তন ছাত্র)

তুমি এলে তাই
জীবনে বসন্ত ফিরে আসে,
তুমি এলে তাই
ভালোবাসা হাতছানি দিয়ে ডাকে।

তুমি এলে তাই
আজ নয় আমি একা,
তুমি এলে তাই
প্রেম লাগে না ফাঁকা।

তুমি এলে তাই
জীবন হয়েছে ধন্য,
তুমি এলে তাই
আজ আমি অন্য।

তুমি এলে তাই
মন দিয়েছি কাজে,
তুমি এলে তাই
ছেড়েছি আড্ডা বাজে।

তুমি এলে তাই
মনে নতুন রং লাগে,
তুমি এলে তাই
স্বপ্নে চেয়েছি আমি যাকে।

তোমাকে দেখার পরে

— লোকনাথ লাহা

মেঘলাকাশে উড়ছে পাখি
আপন মনে কোথা,
ভীষণ আমার ভয় হয়
লিখতে কবিতা।

যেই না ভাবি লিখবো আমি
অমনি খাতা খুলি,
এমন সময় তোমায় দেখে
সব কিছু যে ভুলি।

বানান হয় এলোমেলো,
শব্দ আগের পরে,
দু'চোখ শুধু তোমায় দেখে
বলতে নাহি পারে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি
তোমার চোখের মাঝে
জানিনা কেন এমন হয়,
মন তোমাকে খোঁজে।

একটু ভাবি যাই না কাজে
কথা বলার তরে,
এমন সময় ফুড়ুৎ করে যাও
আকাশে উড়ে।

ভীষণ জ্বালা শুরু হল
কষ্ট পাই আমি,
বুঝেও কেন বোঝ না
দুষ্টু পাখি তুমি।

আমার প্রশ্ন

— মুনমুন ধাড়া
(২য় বর্ষ)

ভালোবাসি তোমায় ছোট এই কথাটি
বলতে গিয়ে, গলায় আটকে গিয়েছে বারবার।
ভালোবাসব তোমায় চিরকাল খুব সত্যি এই কথাটি
বলতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছি বারবার।
তুমি বলবে এতো ভীতু কখনো দেখিনি,
মেয়েরাও তো অনেক সত্যি কথা মুখের
উপর স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা পায়,
ভয় পায়, মেয়েদেরও অনেক জ্বালা। তাই, তুমি
কখনো জানতে পারো নি
কেউ একজন শুধু তোমার কথা ভাবে .....
শুধু তোমার স্বপ্ন দেখে .....
যদি তুমি জানতে, কি বলতে আমার উত্তরে?
কী করতে আমায় ভালোবাসতে ..... ?
এ প্রশ্ন আমার আজও প্রশ্নই
থেকে গেল
আজও তুমি আমার আকাশে
বৃষ্টি হয়ে নেমে এলে না .....
আমাকে ভিজিয়ে দিলে মৌসুমী হাওয়ার টানে,
ভাসতে ভাসতে আবার
চলে যাবে না তো অন্যের আকাশে ..... ?

কবিতা

— সাহানা খাতুন
(বি.এ., ১ম বর্ষ)

কবিতা আসে প্রেমিক মনে
কবিতা আসে ব্যর্থ প্রেমে।
কবিতা আসে ব্যথা পেলে
কবিতা আসে আঘাত দিলে।
কবিতা আসে দুঃখ-ভরা স্বপ্ন নিয়ে
কবিতা আসে পাখির ঠোঁটে শিস দিয়ে।
কবিতা আসে আকাশ ভরা তারা দেখে
কবিতা আসে ফুলের পরাগ রেণু মেখে
কবিতা আসে, টাপুর-টুপুর শব্দে শুনি
কবিতা মানে প্রেয়সীর পদধ্বনি।
কবিতা আসে পাহাড়-নদী-ঝরণা বেয়ে
কবিতায় থাক না এক কালো মেয়ে।
কবিতা আসে সৃষ্টি-সুখের আনন্দে।
কবিতা আসে ধ্বংসের প্রতিবাদে।
কবিতা জন্ম নেয় পথ চলিতে
কখনো বা মনের চোরাবালিতে।
সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন
যখন থাকে খুব প্রয়োজন
কবিতা আসে না যখন-তখন
কবিতা বাস্তবিকই গভীর মনন।

শুধু তুমি

— সেবিকা দে
(সাম্মানিক দর্শন, ৩য় বর্ষ)

আমার হৃদয়ে জুড়ে আছ শুধু তুমি
তুমি ভুললেও ভুলব না তো আমি
তোমার ঐ স্পর্শ, হাসি, কথাগুলো ভুলব না কখনও
আজ আমার থেকে দূরে সরে কি ভুলে গেছ সেই মুহূর্তগুলো?
স্বপ্নে দেখি, রয়েছ তুমি আমার পাশে
ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি নেই তো তুমি কাছে।
ভোলা কি যায় তার সাথে কাটানো দিনগুলো
কিন্তু কীভাবে ফেরাব সেই আনন্দগুলো
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রয়ে যাবে শুধু তুমি,
কখন যে তোমায় কাছে পাব সে আশায় বসে আছি আমি।।

ফেসবুক

— রবিয়াল মণ্ডল
(প্রাণীবিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ)

সামলাতে পারবি না, এত সঙ্গী কেন খুঁজিস তুই?
ভয় পাস না কিছু পাওয়ার জন্য
এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করছি না তোকে
তুই স্রেফ একবার আয়,
ডেস্কটপ থেকে বেরিয়ে আয় — এসে
দু'চড় মার আমার গালে .....
আমি বুঝি; শুধু সঙ্গী নয়
এখনও অন্তত একজন বন্ধু আছে আমার।

দুঃখ দিওনা

— সৌরভ মণ্ডল
(সাম্মানিক গণিত, ১ম বর্ষ)

আমার আনন্দ দিতে না পারো
কখনো দুঃখ দিও না
আমায় সঙ্গ দিতে না পারো
নিঃসঙ্গ করো না।
আমায় ভালোবাসতে না পারো
কখনো ঘৃণা করো না।
আমার উপকার করতে না পারো
কখনো হেয় করোনা।
আমায় বন্ধু ভাবতে না পারো
কখনো শত্রু ভেবো না।
আমায় কাছে না ডাকতে পারো
দূরে ঠেলে দিও না
আমায় আপন না ভাবতে পারো
পর ভেবো না
আমায় জীবন না দিতে পারো
কখনো মরতে বলো না।

What The Mind Is?

– Uma Karmakar
English Hons. (B.A., 2nd Year)

The mind is God in part
The mind is invisible Lord in heart
So, if you be a human being
Try to call to mind Him meditating.

The mind is heaven and holy place
That is in your corporeal frame
Never impure and unclean this
Undoubtedly the royal garden He lives.

The mind has a vision — an insight
It can only rejoice not regret
He comes at every birth
Having no death, nor dearth.

मा

दिव्या प्याटेल
(बि.ए., प्रथम वर्ष)

मा संसार की खुशी,
मा है बाच्चो की हांसी।
मा है सबसे बाडी हास्ती
दौलत की खातिर काभी
ना मा को ठुकराओ।
मा काभी रूठ याय तो,
पेयार से मानाओ।
पेयार से देखो तो,
मा का मोल ह्राय,
सारि दुनिया मे मा आनमोल ह्राय।

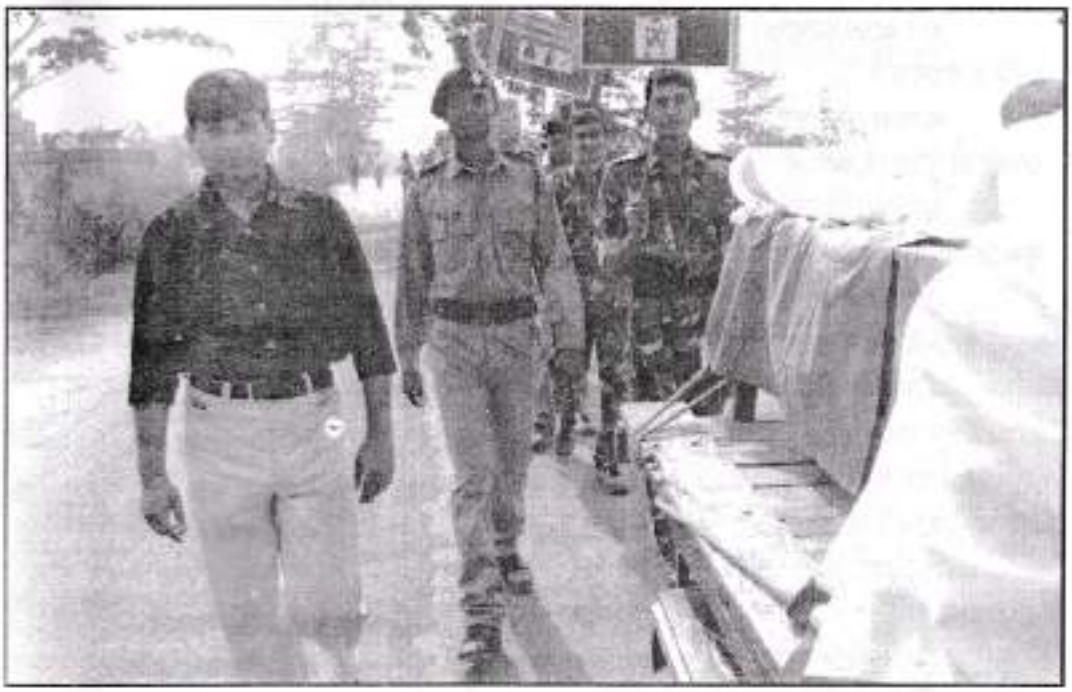

এন.সি.সি., সোনামুখী কলেজ ইউনিট-এর বিভিন্ন কর্মসূচীর চিত্র।

তুমি নেই

— প্রদীপ বাড়ুই
(প্রাক্তন ছাত্র)

নীরবে বসে থাকি
লাগে ভারি ফাঁকা,
তুমি নেই কাছে
মন বড়ো একা।
জানি না আজ তুমি
আছ কোন্ দূরে,
শুধু জানি আজও আছো
হৃদয় মাঝে।
মাঝে মাঝে ভাবি বসে
কি অপরাধ?
কোন দোষে পেলাম
এত বড়ো আঘাত।
হারিয়ে যাবে যদি
বাসলে কেন ভালো,
কেনই বা দু'চোখে আমার
জ্বালালে প্রেম-আলো।
ভুলতে পারি না আজও
তোমার কথা,
মনে পড়লেই প্রাণে লাগে
ভীষণ ব্যথা।
আজও পথ চেয়ে
বসে থাকি আমি,
এই আসছো এই আসছো
প্রিয়তমা তুমি।
ব্যর্থ আশা অমার
গুমরে কাঁদে
স্মৃতি যেন নীরবে
পিছু পড়ে থাকে।

আগমনী

— বাশিনাথ পাঁজা

বৃষ্টিভেজা শরৎ আকাশ
শিউলি ফুলের গন্ধ,
মা আসছে আবার ঘরে
পড়াশোনা বন্ধ।

মা আসছে তাইতো আবার
বাজনা বাজায় ঢাকি,
দিন গুণে দেখতো ভাই
মা আসতে ক'দিন বাকি?

ভালোবাসায় এত কষ্ট

— অঞ্জু গরাই

তুমি ফিরে আসবে আবার আমার জীবনে
এই বিশ্বাস যেদিন ভেঙ্গে গেছে,
সেদিন থেকে হয়তো নিজেকে পুনরায়
সাজাতে অনেক চেষ্টা করছি,
বাঁচার চেষ্টা করছি জানিনা কতটা পেরেছি।

তবে জীবনের কাছে হার মানিনি,
তবুও মাঝে মাঝে তোমার নিষ্পাপ মুখটির
পিছনে লুকিয়ে থাকা ছবিটার কথা মনে হলেই
আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়.
বুকের মাঝে জমে থাকা কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে
দু'চোখ
বেয়ে নেমে আসে।

বুঝে উঠতে পারিনা এই অশ্রুগুলো কিসের?
তোমার মিথ্যা ভালোবাসার নাকি অভিনয়ের?
না আমার স্বপ্নগুলো হারানোর?

শুধু বলবো তুমি আমার পৃথিবীটা চিনতে ভুল
করেছো ....।
হয়তো কোন একদিন তুমি যাকে ভালোবাসবে
সে তোমার কষ্টটা অনুভব করবে না।
সেও তোমার
পৃথিবীটা চিনতে ভুল করবে।
আর তখন হয়তো বুঝতে পারবে ক্ষত-বিক্ষত
হৃদয়ের
বেদনাগুলো
কষ্টের চিৎকার করা কান্নার শব্দগুলো,
বুঝতে পারবে সবকিছু থাকার পরেও
কি যেন একটা নেই।
অদ্ভুত শূন্যতায় প্রতীক্ষিত মানুষের
ফিরে আসার অপেক্ষা করবে,
সেদিন হয়তো আমি এই পৃথিবী ছেড়ে
অনেক দূরে চলে যাবো ....

নতুন করে বাঁচতে শেখা

— হামিরুদ্দিন মিস্ত্রী
(বি.এ., ১ম বর্ষ)

আবার নতুন করে বাঁচতে শিখি –
সাঁওতালী মেয়েটিকে দেখে,
এক বোঝা কাঠ নিয়ে মাথায়
এই গ্রীষ্মের তপ্ত মাটিতে
সাবধানে পা ফেলে।
বহু স্মৃতি বিজড়িত
প্রপিতামহদের কাছে
শিখেছি বেঁচেথাকার মন্ত্র;
এইসব রত্নকথা ক্ষয়হীন
অদৃশ্য লিপিতে লেখা আছে
মাটিতে, অরণ্যের বুকে
পুরাতন মহুয়ার বাকলে,
ধামসা-মাদলের সুরে –
আজও বাতাসে শত শত
পূর্বপুরুষের দীর্ঘশ্বাস!
প্রাচীন মানুষেরা বলে
শান্তির নীড়ে মাথা ঠুকেছিলাম –
তাই আজ এত রক্তঝরার দিন,
কষ্টের দিন;
শুধু অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারার মতোই
ঝরে পড়ে পথে-ঘাটে।
অন্ধকার তিমিরে গা মিশিয়ে
বেঁচেছিলাম বহুদিন – আর নয়,
দারিদ্রের এঁদোপড়া অভাবগুলোকে
পৃথিবীর এককোণে ঠেলে ফেলে
আবার নতুন করে বাঁচতে শিখি –
যেমন বেঁচেছিল পিতামহেরা
অনেক-অনেক দিন আগে,
ঘাম ঝরিয়ে।

রক্ত দান

— সুজয় কুমার মোদক
(সাম্মানিক বাংলা, ১ম বর্ষ)

জীবন পথে রক্তদান
বাঁচাও মোদের মৃত প্রাণ।
একের রক্ত অন্যে দাও
বিনিময়ে আনন্দ পাও।
বিপদেতে পাশে থাকো
ভরসা দিয়ে ভালো রাখো।
পাঁচ মিনিটের রক্তদান
বাঁচায় একটি মৃত প্রাণ।
রক্তদান মহান দান
চাই নাকো কোনো প্রমাণ।
তাই তো মৃত্যু পেয়েছে ভয়
হোক না রক্তদানেই জয়।

আগামী পৃথিবীর জন্য

— মধুমিতা ধাড়া
(বি.এ., ২য় বর্ষ)

আমরা জানি না, এক শতাব্দী পরেও
এ পৃথিবী বেঁচে থাকবে কিনা
আমরা জানিনা,
মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে কিনা শেষতম জীবন।
আমরা জানিনা,
মস্ত সীমা একদিন হবে কিনা হিরোসিমা।
আমরা জানি না,
হিমালয় আবার ডুব দিবে কিনা টেথিস সাগরে।
আমারা জানি না,
আমাদের সকলেরই নখ হয়ে যাবে কিনা ধারালো ছুরি।
আমরা জানি না,
ভালোবাসার কথা শুনলেই
সবাই বধির ও অন্ধ হয়ে যাবে কিনা।
আমরা জানি না,
'মুক্তি' শব্দটি শুধু লেখা থাকবে কিনা ইতিহাসের পাতায়।
আমরা জানি না,
ইতিহাস রচনার জন্য থাকবে কিনা কোন ঐতিহাসিক।
আমরা জানি না,
একদিন শেষ হয়ে যাবে কিনা এই সব প্রশ্ন?
তবুও আমরা এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাবো।
আগামী পৃথিবীর জন্য দিয়ে যাবো ঘাম ও অশ্রু
আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাবো –
অন্ততঃ একটি স্বপ্নের উপহার।

ছোট্ট আশা

— লাবণী পরামাণিক
(সাম্মানিক সংস্কৃত, ২য় বর্ষ)

ছোট্ট আশা
বুকের ভেতর
ছোট্ট আশা
মনে,
ছোট্ট আশা
তোমাকে পাবার
একা কোনখানে।
ছোট্ট আশা
গল্প শুধু
ছোট্ট আশা
জীবন,
ছোট্ট আশা
ভালোবাসায়
হয় যেন
মরণ।
ছোট্ট আশা
তোমাকে ঘিরে
ছোট্ট আশা
ফন্দি,
ছোট্ট আশা
মনের ঘরে
আজ হয়েছি বন্দি।
ছোট্ট আশা
তোমার তরে
ছোট্ট আশা
বুকে,
ছোট্ট আশা
প্রার্থনা
তুমি থাকো
সুখে।

Students

– Siddheswar Nag
English Hons. (B.A., 3rd Year)

Students are the heart and soul of society,
Without these, we are dead.
Students are the joy and the source of colour
Without these, the society is dead.
They flow like rivers, grow like trees,
Run like leopards, their minds are free.
Free from bondage, free from all sins,
Those could have stopped the spirit of Pupils.
But unrequited love and corruptions,
Rudely cursh them, as a roller.
O God! Why are you thinking so,
To give them the indomitable power.
Oh! Jesus! Please rescue them beneath the tomb
And transplant their souls into the realm of power.

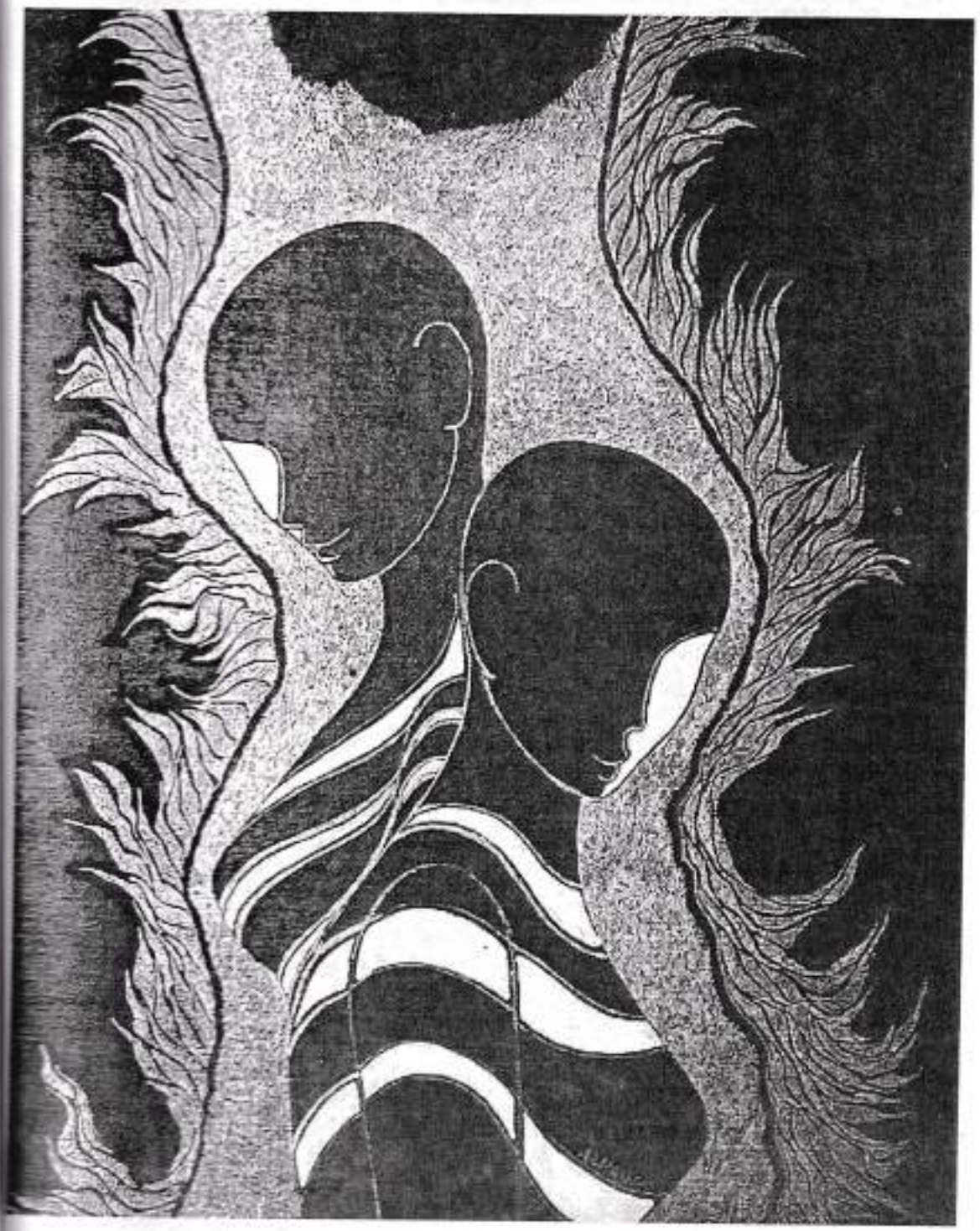

আমার মা

— ভুপেন লোহার
(বি.এ., পাশ-৩য় বর্ষ)

এ জগতে মায়ের মতন
আছে কে আর?
তাই তো আমি জানাই
মাকে অশেষ প্রণাম।
মা-ই ঈশ্বর
মা-ই দেবতা।

শোধ হবে কী
মায়ের ঋণ?
সন্তান যে গর্ভে রাখে
দশমাস দশ দিন।

পৃথিবীতে আসে সেই শিশু
বন্ধন ছিন্ন হলে,
তখন তাকে আগলে রাখে
মা ভিন্ন কে?
নিজের দুধ খাইয়ে মা
বাঁচায় সন্তানেরে।

ছেলের সুখ সুখ যে তার
তারই দুঃখে দুঃখী .....
সন্তান ছাড়া বাঁচে না মা
ছেলেই যে তার আঁখি।
সে লোকের কাছে মন্দ হলেও,
মায়ের কাছে ভালো
জগৎ যদি অন্ধকার হয়
সে মায়ের কোলে আলো।

হ্যাবিট

— কৌশিকী নাগ
(সাম্মানিক সংস্কৃত, ১ম বর্ষ)

বাবার হ্যাবিট কাগজ পড়া
বাজার থেকে এসে।
মায়ের হ্যাবিট রান্না করা
রান্নাঘরে বসে।
দাদার হ্যাবিট গল্প করা
বন্ধুর বাড়ি গিয়ে –
বোনের হ্যাবিট উত্তর লেখা
মানে বই নিয়ে।
দিদির হ্যাবিট তৈরী করা
কাঁচা আমের আচার –
আমার হ্যাবিট লুকিয়ে লুকিয়ে
করা পেটে পাচার।

প্রেম এখন

— জালিমা খাতুন
(বি.এ., ১ম বর্ষ)

এখন প্রেম ভালবাসা বলে
কিছু হয় না,
নিছক বাতিক কিংবা
মন ভোলানো সব বায়না।
আগে প্রেম হত দুটি
মনের মিলনে,
এখন প্রেম হয়
শরীরের টানে।
আগে প্রেম ছিল দুটি
হৃদয়ের পবিত্র বন্ধন,
এখন প্রেম মানে
কামনার আদিম নিবেদন।
আগে প্রেম এসে মিলিত
হত বিয়ের পিঁড়িতে,
এখন প্রেম এর মৃত্যু ঘটে
কারও বাগান বাড়ীতে।
আগে প্রেমের আকুতি প্রকাশ পেত
পত্র বা চিঠিতে,
এখন সব কিছু লুঠ হয়
ফেসবুক ও মোবাইল চ্যাটে।
ক্ষণিকের আলাপ বা
ক্ষণিকের পরিচয়,
হয় না মন দেওয়া নেওয়া
হয় শরীরের বিনিময়।
প্রেম সকাম না নিষ্কাম
প্রশ্ন দিলাম তুলে,
উত্তর দিও তোমরা
সময় পেলে।

রাতের কথা

— মহঃ ফারুকুল মিস্ত্রী
(বি.এ., ১ম বর্ষ)

এখন মধ্যরাত
বিছানায় শুয়ে উপাধানে মুখ গুঁজে
কি ভাবছ তুমি?
অতীতের স্মৃতি!

পুরন্দর স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি .....
নেই কোন দাম তার!
শুধু চোখের জল
কি ভাবছ, প্রেম!
ভেবে কি হবে!

প্রেম ভালোবাসা আজ উবে গেছে
পৃথিবী থেকে।

ভুলে যাও প্রেমের নায়িকা
ভালোবাসার পৃষ্ঠা দাও উল্টে
শুধু জ্বলে ওঠো!

মা

— শুভঙ্কর বসু
(সাম্মানিক সংস্কৃত, ২য় বর্ষ)

মা গো তোমার তুলনা নেই এই পৃথিবীতে।
তোমার এই ঋণ পারব না শোধ করিতে।।
তুমি আমায় দেখিয়েছিলে পৃথিবীর এই আলো।
তাইতো মা গো তোমায় বাসি এত ভালো।।
যদি কোনো দিন চলার পথে ভুল করি আমি
আমায় ক্ষমা করে দিও মা-গো তুমি।।
তুমি আমার পরম প্রিয়, তুমি আমার মা;
মা-গো আমি তোমায় কভু ভুলিতে পারব না।।
সারা জীবন মা গো তোমায় করিতে চাই সেবা
তুমি ছাড়া এ জগৎ-এ আছে মোর কে-বা।।
কখনও যদি ভুল করে, করে থাকি আঘাত
সব ভুলে ভালোবেসে বাড়িও তোমার হাত।।
তোমার ঐ দুই হাত রাখ মা আমার মাথায়
সারা জীবন আমি যেন চলতে পারি তোমার কথায়।

অন্ধকার রাত

— শান্তনু দে
(সাম্মানিক বাংলা, ২য় বর্ষ)

চমকে দেবো তোমাকে
কোনো এক 'অন্ধকার রাতে'
কারণ, পূর্ণিমা আমার ভালো লাগে না
চাঁদ যখন ম্লান করে দেয় তারাদের আলো
সেই সময় আকাশের পানে তাকিও
দেখবে জ্বলজ্বল করছে সুন্দর তারা
বিভোর করবে তোমার মন
আর ধ্রুবতারা পথ দেখাবে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের
ধীরে ধীরে তুমি যখন নিজেকে হারাবে
ঠিক তখনই তোমাকে চমকে দেবো আমি
মনে রেখো কোনো এক 'অন্ধকার রাতে'
আমি চমকে দেবো তোমাকে।।

কল্পনার ভালোবাসা

— অনীষা ব্যানার্জী
(সাম্মানিক ইংরাজী, ১ম বর্ষ)

কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা
একটি ছোট্ট সবুজ পাতা
ওখানে সযত্নে লিখে রেখেছিলাম
আমার ভালোবাসার কথা।
নিজের অজান্তেই কখন অন্তরে
এঁকেছিলাম তোমার মুখ
সেটা তো আমি জানি না, তবে কল্পনাতেই পেতাম
অপরিসীম সুখ।
খুঁজেছি কত, পাগলের মতো তবুও
খুঁজে পাইনি তোমায়
হয়তো আমার কাছে আসার তখন ছিল না
তোমার সময়।।
হঠাৎ, একদিন সকালে উঠে দেখি,
সেই সবুজ পাতা,
আপন আনন্দে বাতাসের সাথে
দুলিয়ে যাচ্ছে মাথা।
যেন সে অনুভব করেছে, তার
মনের মানুষের উপস্থিতি,
আর সেই পাতায় লেখা আমার ভালোবাসাও
পেয়ে গেছে পরিণতি।।

কল্পনার তুলিটা দিয়ে যেমন এঁকেছিলাম,
সেই এক চোখ, সেই এক মুখ
পেয়েছি আমি পেয়েছি খুঁজে আমার ভালোবাসা
মনের আশা, হৃদয়ের নেশা সেই
বহু প্রতীক্ষিত ভালোবাসা
সেই কাজল কালো চোখ, সেই হৃদয় মাতানো
মিষ্টি ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসি,
সেই ঘন কালো মেঘের মতো চুল, আর
এই মেয়েকেই তো আমি ভালোবাসি।।
হয়তো ভগবান তোমায় বানিয়েছেন
আমার কল্পনার রঙিন তুলি দিয়ে।
সেই চলন, সেই কথা বলা, সেই হাসি
তুমিই তো আমার কল্পনার সেই মেয়ে
চলে এসো আমার মনে, রেখে দেব পরম সযত্নে,
মনের তাজমহলে মুমতাজ করে, জীবনটা দেব খুশিতে ভরে,
তোমায় আলতো স্পর্শ করে, মনটা আমার উঠবে ভরে
এভাবেই তুমি সারাটা জীবন থাকবে হয়ে আমার মনে
দুঃখ, আনন্দ, আশা।
কারণ কী জানো? তুমিই আমার কল্পনার সেই
অচেনা, অজানা, মিষ্টি ভালোবাসা।।

গরীবের কান্না

— মন্টু ঘোষ
(বি.এ., ৩য় বর্ষ)

হাসছে ধনী টাকার গর্বে?
এই পৃথিবীর বুকে,
কাঁদছে গরীব নিজের ঘরে,
নেই টাকা সিন্দুকে।
ধনীর ঘরের ছোট শিশু
খাচ্ছে দুধ আর ফল,
গরীবের ঘরে দুধ নেই তাই,
দিচ্ছে শুধু জল।
ধনীর মেয়ের হচ্ছে বিয়ে
কিনছে টাকায় বর,
গরীব মেয়ের বিয়ে দিতে
বিক্রি করে ঘর।
ধনীর ঘরের কুকুর যেথা,
যত্ন বেশী চায়,
গরীব সেথা চাকর সেজে
মাসে বেতন পায়।
বুঝতে আমি পারিনি আজো,
গরীব কেন কাঁদে,
তাদের দুঃখ দেখে আবার
ধনী কেন হাসে।।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

— চন্দন ঘোষ
(১ম বর্ষ)

আজ পৃথিবীর অন্তরে চলেছে বড়ো সর্বনাশ।
উষ্ণতা আজ বেড়ে চলেছে, সুমেরু-কুমেরু হচ্ছে গ্রাস।।

C.F.C. আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড তার আপন রোলে।
বায়ুস্তরে বিক্রিয়া তার ওজন হোলে।।

প্রান্তরে যে বরফ রাশি –
তলিয়ে যাবে উপকূলের উপবাসী।

অতি বেগুনি কেমনে যাবে
ক্যান্সারে তাই মানুষ খাবে।

গ্রিন হাউস এর উষ্ণ তাপে
কার অভিশাপ – কার যে শাপে!

বায়ুস্তরের স্বচ্ছ আঁশে,
বিজ্ঞান তার পূর্বাভাসে।

গাছ কাটা আর A.C.-র দায়ে
মানুষ কুড়াল মারে আপন পায়ে।

বন্ধ করো বন্ধুগণ –
করো এবার বৃক্ষ রোপণ।

একাকী অরণ্যে

— সন্দীপ ডুঁই
(২য় বর্ষ)

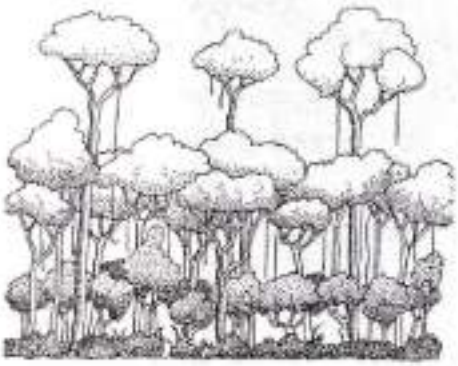

একা একা বসে, কত অজানা কথা মনে আসে –
এ বিশাল নির্জন অরণ্যে।
শুধু আমি আর আমিতে মেশামেশি –
আর মন যেন কল্পনা-বিভোর,
সুদূরে থাকা অভিমানীনি প্রিয়ার জন্যে।
এখানে আছে মিষ্টি-মধুর নানা পাখির, নানা কলতান,
আর আছে, কুয়াশা ভেদ করা সূর্যের রশ্মি।
সবুজ পাতায় হালকা সোনালি আভা,
ঘুম ভাঙা পাখিরা গায়, অরণ্যের ঘুম ভাঙানোর গান।
মনে যেন উপভোগ করে শুধু একাকীত্বের অনুভূতি –
আর ভেসে চলে যায় অচেনা কল্পনার জগতে।
এ-অরণ্যের মাঝে মনে হয়, আমি যেন মিশে আছি আমিতে।
এই সারিবদ্ধ মহীরুহের ভীড়, আর মাঝে সরু পথ –
যেন পৌঁছে গেছে শান্তির ঠিকানায়।
যেখানে প্রসারিত হয় বাহু, মুক্ত হয় মন –
আর আঁখি দুটি চেয়ে থাকে, ডালের ফাঁকে উঁকি দেওয়া নীলে
যেখানে কোনো দুঃখ, বেদনার চিহ্নমাত্র নাই।
এ বিশাল অরণ্যের মাঝে আমি ফিরেপাই –
আমার কবিতা, আমার অনুভূতি, আমার প্রাণ,
আর পাখিদের কলরবের মাঝে, আমার হারানো গান।
কল্পনার জগৎ ভুলি, মনে পড়ে সময় চলমান –
তাই আরো মনে হয় – এই যে মহীরুহের দল,
এরা তো একই স্থানে, একই ভাবে বিদ্যমান।
তাই আরো মনে হয় – এই অরণ্যের পাশে –
গড়ে ওঠা নগর যদি সবুজের উপর ধেয়ে আসে?
পালানোর পথ নাই এদের কোথাও।
একদিন নিষ্ঠুর মানুষের দল, করে দেবে এদের উধাও।
বানাবে ফ্ল্যাট, ঝাঁ-চকচকে বড়ো বড়ো শপিং মল,
কিন্তু সবুজ প্রকৃতি তার স্বভাবে, সেবা করে যাবে অনর্গল।
জানি, একদিন ধূলিস্যাৎ হবে এ-বিশাল অরণ্য –
সেদিন হয়তো হারিয়ে যাবে একাকীত্বের অনুভূতি,
সেদিন আর আমার একলা বসে কবিতা লেখা হবে না –
সেদিন সবুজেরা কালো ধোঁয়ায় মুছে যাবে মানুষেরই জন্য।

গাছ কেটো না

— চিন্ময় বৈদ্য
(বি.এ., ৩য় বর্ষ)

গাছ কেটো না গাছ কেটো না
ও কাঠুরে ভাই,
গাছ কাটলে কি ক্ষতি হয়
জানো নাকি তাই।
প্রকৃতিতে যত কিছু
গাছের জন্যই ঘটে?
পরিবেশের সঙ্গ ও-সে
কেউ কি তাকে কাটে?
কাটলে পরে রক্ত বেরোয়
ভাঙলে শাখায় লাগে।
কাটছো কেন গাছটি তুমি?
বাঁচাও ওকে আগে।
ফুলটি দেবে ফলটি দেবে
দেবে তোমায় ছায়া।
তবুও ওকে কাটছো তুমি
নেই কি তোমার মায়া??

এখনো ভালোবাসি তোমায়

— ঋতেন্দু পরাই

মনে হয় আর কখনো আসবে না তুমি,
তবুও তোমারই আসায় দিন গুণছি আমি ....
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখি
ভালোবাসি বলে এখনো ছবি আঁকি ......
জানিনা কি তোমারই স্বপ্ন
কিন্তু আমার স্বপ্ন তুমি ......
তুমি আমার সব অনুভব .....
মনে হয় আমার জন্য শুধু তুমি,
যদি কখনো মনে পড়ে আমায়
ভুল করে যদি এক ফোঁটা জল পড়ে চোখের
মনে রেখ আমার ভালোবাসা তোমাকে
ছুঁয়ে যায় .....
তোমারই হৃদয় জুড়ে।।

ফুল

— ঝুমা মণ্ডল
(কলাবিভাগ, ২য় বর্ষ)

জানতে চেও না আমার ব্যথা
পারবে নাকো বইতে
শুনতে চেওনা আমার কথা
পারবো নাকো সইতে।।

আমি যে চাই গন্ধ ছড়াতে
আমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ করতে
যারা পারে আমায় সইতে
তারাই করে ভুল।

নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা
আমি একটা ফুল।
আমি যখন ছিলাম কুঁড়ি
আদর ছিল কত,
যেই মেললাম আমার পাপড়ি
হাতের ছোঁয়ায় ক্ষত।

আমার কত ছিল স্বপ্ন
নতুন ফুলকে দেব জন্ম
কিন্তু আশা আমার হল না পূর্ণ
হয়ে গেলাম বৃন্ত-ছিন্ন।।

আমি যে চাই থাকতে গাছে
আরও সৌন্দর্য প্রদান করতে
কিন্তু এরা চায় না নিতে
কী নীতি এই পৃথিবীতে?

লেখাপড়া

— রমা রায়
(সাম্মানিক বাংলা, ১ম বর্ষ)

লেখাপড়াটা দেখছি এখন
একেবারেই বাজে,
পাশ করে সব ডিগ্রিগুলো
লাগছে নাকো কাজে।
তাই দেখছি কত ছেলে
এম.এ., বি.এ. পাশ,
দিনরাত্রি ক্লাবে গিয়ে
খেলছে খালি তাস।
ছোটবেলায় শুনেছিলাম
মন দিয়ে যে পড়ে,
সেই নাকি গাড়ি চাপে
ঘোড়ার পিঠে চড়ে।
এখন দেখছি সেই নিয়মটা
উল্টে গেছে ভাই,
গাড়ি ঘোড়া চড়তে গেলে
পকেটের জোর চাই।
রসিকতা স্রেফ এটা
রসিকেরাই জানে,
বিদ্যে-বুদ্ধি না থাকলে
কেইবা কাকে মানে।

ইচ্ছে করে

— স্নিগ্ধা পাল
(সাম্মানিক বাংলা, ১ম বর্ষ)

ইচ্ছে করে সকালবেলায় সূর্য্যিমামা হতে,
ইচ্ছে করে পাখি হয়ে ডানা মেলে উড়তে।
ইচ্ছে করে বৃষ্টি হয়ে টাপুর-টুপুর পড়তে
ইচ্ছে করে গাছে গাছে ফুল হয়ে ফুটতে।
ইচ্ছে করে বাতাসের মতো ঘুরে ফিরে বেড়াতে
ইচ্ছে করে নদী হয়ে আপন গতিতে চলতে।
ইচ্ছে করে তারা হয়ে রাতের আকাশ ভরতে
ইচ্ছে করে বাঁশি হয়ে সুরে সুরে বাজতে।
ইচ্ছে করে বাউল হয়ে গান গেয়ে বেড়াতে
ইচ্ছে করে আকাশের সাতরঙ্গা রামধনু-রং হতে।
কত যে ইচ্ছে রয়েছে এই মনেতে
হয় না কেন ইচ্ছাপূরণ, ইচ্ছা করে জানতে।

আমরা দু'জন

— মাম্পি মিস্ত্রি
(১ম বর্ষ)

আড্ডা হাসি তর্ক মজা
আমরা দু'জন মিলে,
পড়াশোনার ব্যাপারটাতে
আমরা সবাই ঢিলে।
ক্লাসের শেষে দুপুর বেলায়
আড্ডা মারার ধুম,
সন্ধ্যা হলেই মোদের চোখে
নেমে আসে ঘুম।
টি.ভি. দেখা, চ্যাটিং করা
এইতো হল কাজ,
পড়তে হলে মাথার উপর
ভেঙ্গে পড়ে বাজ।
ঘোরাফেরা শুধুই ডেটিং
সময় পেলেই বাইরে ইটিং,
রোল, ফুচকা, চাউ, মোগলাই
হাসি ছাড়া আর কিবা চাই?
এসব নিয়েই সুখের জীবন,
ভালোই আছি আমরা দু'জন।।

জানি আমি

— সুদেষ্ণা বিশ্বাস
(সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা, ১ম বর্ষ)

জানি আমি এই লেখা
পড়বে না তো কেউ,
তবুও জাগে হৃদয়ে মাঝে
হাসি খুশির ঢেউ।
নয়তো ছড়া নয়তো কবিতা
নয়তো কোন ছন্দ,
জেনে শুনে নিজের কাছে
লাগলো না তো মন্দ।
গল্প লিখি উপন্যাস আর
নিত্য নতুন ছড়া,
হয় না কিছুই শুধু শুধু
নষ্ট করি পড়া।
কেউ বা বলে যা লিখেছিল
নকল কিংবা চুরি,
বয়স তাদের খুব বেশি জোর
হবে বছর কুড়ি।
তবুও জাগে হৃদয়ের মাঝে
হাসি খুশির ঢেউ,
জানি আমি এই লেখাটি
পড়বে নাতো কেউ।।

বন্ধু

— অমৃতা রায়
(সাম্মানিক ইংরেজী, ১ম বর্ষ)

সকালবেলা ছাদে উঠে আকাশ পানে দেখি।
ডানা মেলে উড়ছে যেন ছোট্ট একটা পাখি
নামলো সে আমায় দেখে; বললো, কাছে এসে।
তুমি আমার বন্ধু হবে? রইবো পাশে পাশে।।
আমি বললাম, বন্ধু মানে? কেমন বন্ধু হব।
পাখিটি কয় মনের কথা, প্রাণের কথা যাহার কাছে কব।।
আমি বললাম, তবে আর কি, বাড়িয়ে দাও হাত।
বন্ধু-বন্ধু গল্প হবে সারাটি দিন-রাত।।
কয় সে আমায় কলরবে ভাঙ্গিয়ে দেবে ঘুম।
মিষ্টি সুরে গান শোনাবে তাক্ দুম্ তাক্ দুম্।।
বলতে থাকি মনের কথা নিত্য তারই সনে।
দুঃখের দুঃখ ভাগ করে লই যে মনে মনে।।
এই দুনিয়ায় বন্ধু ছাড়া কে বা আছে আর?
ছোট্ট পাখি তোমার মতন বন্ধু মেলা ভার।।

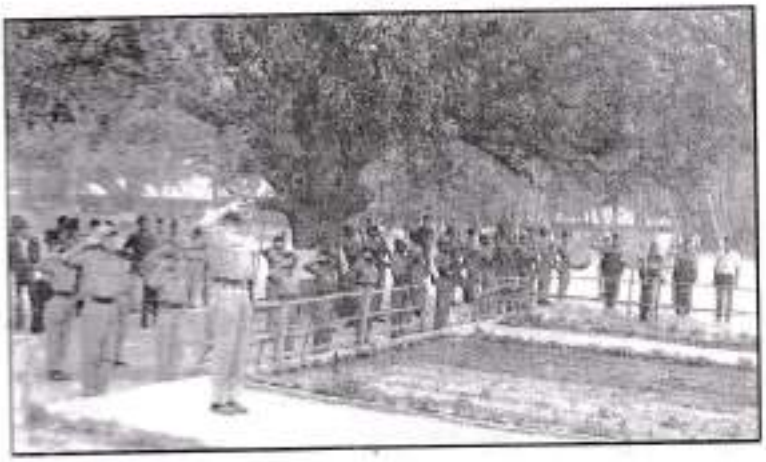

এন.সি.সি., সোনামুখী কলেজ ইউনিট-এর বিভিন্ন কর্মসূচীর চিত্র।

বাংলারই সম্মান

— শামিমা খাতুন
(বি.এ., ২য় বর্ষ)

বাংলা মানে পূণ্য মাটি
বাংলা মানে প্রাণ,
বাংলা মানে মিষ্টি ভাষা
বিশ্বকবির গান।
বাংলা মানে পায়েস পিঠে
মায়ের হাসি মুখ,
বাংলা মানে মিলন মেলা
ঐক্যতানের সুখ।
বাংলা মানে ভালোবাসা
বাংলা মানে গতি,
বাংলা মানে গঙ্গা-পদ্মা
একুশে সম্প্রীতি।
বাংলা মানে পরম্পরা
সংস্কৃতির দেশ,
বাংলা মানে মুক্ত মনের
স্বপ্ন সমাবেশ।
বাংলা মানে আলোর তরী
বিশ্বকবির গান,
বাংলা মানে বিশ্বজোড়া
বাংলারই সম্মান।

বিরহ

— চন্দন ঘোষ
(১ম বর্ষ)

আলোকচ্ছটা পূর্ণিমা এই রাতে
সন্ধ্যাতারা আজও তোমার সাথে।
কেন আজ দুঃখ ভরা মনে
কেন তুমি আছো বসে – আমার মনের কোণে
আমি যে তোমার ভালোবাসি বুঝবে তুমি কবে।
কতদিন আর বহুরূপী সাজে তুমি রবে।
রং মাখানো গোধূলি বেলায় বসে।
তোমার কোথায় মনে বেশি আসে।
রূপ দেখানো পরী তুমি সরল শিশুমন।
বলতে পারো তোমায় ছাড়া থাকবো কতক্ষণ।
ভ্রান্তি নয় – করুণা নয়, তবুও কেন আসে।
জানিনা আমি কেমন করে সবাই ভালোবাসে।
আমি যদি সূর্য হোতাম – সে হতো আমার আলোর বিভা।
শুনতো জীবনে আশা করবো – বাবা মায়ের সেবা।

হয়তো বাধাপথে থেমে যাবে এই ভালোবাসা!
তবুও তোমার কাছে রাখলাম এই অন্তরঙ্গ আশা!
বোঝ না কেন তুমি, ওগো বোঝে না কেন মন .... !
এভাবে আর বিরহ ব্যথা সইব কতক্ষণ ..... ।

জিজ্ঞাসা

— শুচিস্মিতা বর্মবিশ্বাস
(সাম্মানিক সংস্কৃত, ২য় বর্ষ)

তুমি কী?
সাকার না নিরাকার?
রক্ষক না সংহারক?
তুমি কে সেই –
যিনি পৃথিবীকে ধারণ করেছেন?
যখন তুমি যা চাও – তাই হয়।
তাহলে তুমিই কি ভগবান?
শুনেছি তুমি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে থাকো;
কই। দেখতো পাই না,
তাহলে তুমি কী?
মনের এক নব ধারণা?
জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে চলার প্রেরণা,
না মনের মধ্যে জাগানো এক অনুভূতি?
অনুভবেও বুঝতে পারি না তাহলে কী?
প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে
তোমার দেওয়া ওই সুন্দর বাতাস?
এটাই কী তুমি?
এটাই কী ভগবান, যাকে বলে –
মঙ্গলময়।

তোমায় ভালোবাসি

— মন্দিরা ঘোষ
(পাস কোর্স, ১ম বর্ষ)

তুমি আমার চোখে তারা
তোমায় ভেবে দিবারাত্রি হই দিশেহারা।
যখন তুমি থাক আমার পাশে
সব কিছু মধুর হয় তোমার পরশে।
তোমার জন্য রাখতে পারি আমার জীবন বাজি,
যদি তুমি আমার সাথে হারাতে হও রাজি।
কোনো দিন আমি যাব না তোমায় ভুলে,
কথা দাও, কোনো দিন যাবে না আমাকে একা ফেলে।
তোমায় আমি ভালোবাসি মন প্রাণ দিয়ে।

আমরা সবাই ভাই

— নির্ঝর ঘোষ
(সাম্মানিক বাংলা, ১ম বর্ষ)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নই, নইকো মুসলমান,
ভারতের বুকে জন্মেছি মাগো তোমারই সন্তান।
একই আলো, একই বাতাস, একই জলে স্নান,
তবে কেন আমাদের মধ্যে জাতের ব্যবধান।
জাতে নামে বজ্জাতি আজ করছে হানাহানি,
পুত্র পিতার খুন করছে এটা সবাই জানি।
জাত জাত নয় মানুষ মোরা সবাই মোদের ভাই,
একই মাটির গন্ধে মোরা বিলীন হয়ে যাই।
সূর্য যেমন আলো বিলায় নয়কো জাত বিচারে,
মিলে মিশে থাকব মোরা তোমার বুকের পরে।।
জাত-বিচারের দ্বন্দ্বে মোরা এগিয়ে যদি যাই,
অন্য দেশ এগিয়ে যাবে পিছিয়ে রব তাই।
জাত-বিচারের দ্বন্দ্ব ছেড়ে একই গান গাই,
আমরা সবাই ভাই ভাই সবাই মোদের ভাই।

Likes & Dislikes

– **Abir Mondal**
English Hons. (B.A., 2nd Year)

I like smiling face,
I like charming grace.
I like Valentine's Day,
With festive mood and gay.
I like moonlit night,
I like sunshine bright.
I like morning dew,
I like mountain's view.
I like music and melody,
I like lyrical parody.
I like sweet company.
I dislike cacophony.
I like plain living
I like high thinking.
I dislike fair-weather friend
I dislike illegal gain.
Likes make love, love make relation.
Hate makes hate, it brings only pain.

বই আমার বন্ধু

— কর্ণা ঘোষ
(বি.এ.-পাস, ৩য় বর্ষ)

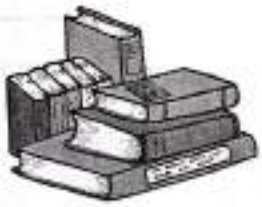

বই আমার বন্ধু ও ভাই
বই আমার বন্ধু
বই ছাড়া মোদের
চলবে না একবিন্দু
বই আমার বন্ধু।
বই যেন সহপাঠী।
বলতে গেলে বই হল
অন্ধের হাতের লাঠি।
নকল বন্ধু সবাই আছে
আসল বন্ধু নেই
বিপদ থেকে বাঁচায় বই
বন্ধু একা সেই।।

হারিয়ে গেছে

— মহাদেব মণ্ডল

হারিয়ে গেছে তুলসী তলায়,
সাঁঝ প্রদীপের আলো।
বিকেল বেলায় আটচালাতে,
আড্ডাটা জমকালো।
হারিয়ে গেছে উঠোন-ছবি
জল ছিটানোর দোর।
হারিয়ে গেছে শিউলিতলায়,
ফুল কুড়োনো ভোর।
হারিয়ে গেছে কাজলা দিদি
বাঁশবাগানের চাঁদ।
কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছে,
শালিক ধরা ফাঁদ।
হারিয়ে গেছে ধানের গোলা
চরকা-যাঁতা-ঢেঁকি।
হারিয়ে যাওয়া গানের সুরে
আকাশটাকে দেখি।

বই আমার বন্ধু

— ঝর্ণা ঘোষ
(বি.এ.-পাস, ৩য় বর্ষ)

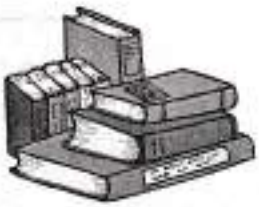

বই আমার বন্ধু ও ভাই
বই আমার বন্ধু
বই ছাড়া মোদের
চলবে না একবিন্দু
বই আমার বন্ধু।
বই যেন সহপাঠী।
বলতে গেলে বই হল
অন্ধের হাতের লাঠি।
নকল বন্ধু সবাই আছে
আসল বন্ধু নেই
বিপদ থেকে বাঁচায় বই
বন্ধু একা সেই।।

হারিয়ে গেছে

— মহাদেব মণ্ডল

হারিয়ে গেছে তুলসী তলায়,
সাঁঝ প্রদীপের আলো।
বিকেল বেলায় আটচালাতে,
আড্ডাটা জমকালো।
হারিয়ে গেছে উঠোন-ছবি
জল ছিটানোর দোর।
হারিয়ে গেছে শিউলিতলায়,
ফুল কুড়োনো ভোর।
হারিয়ে গেছে কাজলা দিদি
বাঁশবাগানের চাঁদ।
কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছে,
শালিক ধরা ফাঁদ।
হারিয়ে গেছে ধানের গোলা
চরকা-যাঁতা-ঢেঁকি।
হারিয়ে যাওয়া গানের সুরে
আকাশটাকে দেখি।

হিন্দু আর মুসলমান

— সন্দীপ ভুঁই (২য় বর্ষ)

সেই এক বৃন্তে দুটি কুসুম আজ দুই মেরুতে অবস্থান –
মনে প্রাণে বিভক্ত যে হিন্দু আর মুসলমান।
ভাগ হয়েছে মনুষ্যত্ব, ভাগ হয়েছে ভালোবাসা –
ভুলে গেছে সব একে অপরকে ভাই ভাই ভেবে কাছে আসা।
একটা মানুষ যখন কোনো মানুষের পরিচয় জানতে চান –
প্রথমেই তাকে জানাতে হয় – তিনি হিন্দু নাকি মুসলমান।
আল্লাহ, হরি দ্বন্দ্ব লাগে নিয়ে তাদের অধিকার –
মন্দির, মসজিদ সেখানেই হয়, প্রাধান্য যেখানে বেশী যার।
মানুষে মানুষে যুদ্ধ লাগার মাঝে এসে যায় ভগবান –
ধর্ম নিয়ে বিদ্রোহী আজ সেই হিন্দু আর মুললমান।
পরিবেশটার চারিদিকে ভরা – হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি –
মানবিকতার দড়ি নিয়ে করছে দু-দল টানাটানি।
জাতের বিচারই বড়ো ধর্ম, হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের মান –
জাতের জন্য হয়েছে ভিন্ন হিন্দু আর মুসলমান।
একদিন যে লিখেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম –
সেই কথাটাই এতদিন তো মনে প্রাণে জানতাম।
সেই কবিতার মর্ম ভুলে মানুষ করে অসম্মান –
একজন যদি হিন্দু হয় আর অন্য জন হয় মুসলমান।
জাতের বিচার, ধর্ম নিয়ে কেন মারামারি পাই না খুঁজে,
সব জেনে বুঝে তবু মোরা থাকি মনুষ্যত্বের মানস চক্ষু বুজে।
মানুষ হয়েও আমাদের নেই সরল মনের মধুর টান –
লাল রক্ত সব শরীরেই তবুও মোরা হিন্দু আর মুসলমান।
সন্ত্রাসবাদী মনোভাব যে প্রকাশিত হয় দিকে দিকে –
দুই ভাইয়ের পৃথকত্ব দেখতে হয় যে ভারত মা'-কে।
হারিয়েছে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, নারীদের যে নাই সম্মান –
তবুও আত্মঅহংকারে মগ্ন আজ হিন্দু আর মুসলমান।
মানুষ তো মোরা মানুষই রইব, হই না যতোই ভিন্ন জাতের –
পানিটা কেবল হতে পারে জল, পারে না হতে ভিন্ন স্বাদের।
হিন্দুরা ডাকে ভ্রাতা বলে আর মুসলিম ডাকে ভাইজান –
মানব ধর্মটাই সবচেয়ে বড়ো, হই না যতই হিন্দু, মুসলিম, আর খ্রিস্টান।

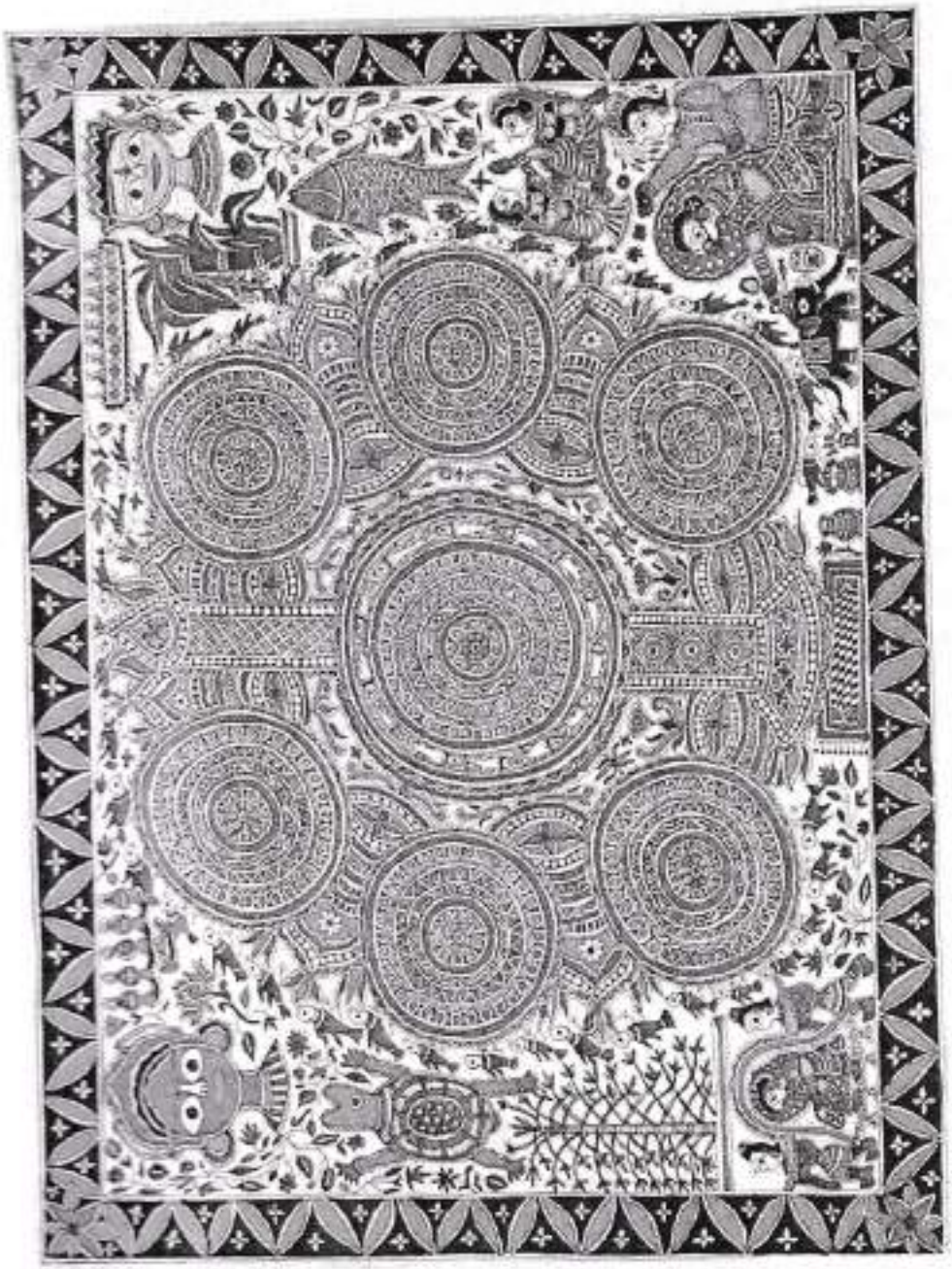

মরা পাথরের বুকে

— বুর্হুব উদ্দিন মণ্ডল

রাত্রি সেদিন জেগেছিল
মরা পাথরের বুকে
নীল আকাশ – গুণেছে
তারাদের ইতিহাস
শুধু ধুয়ে চলে যাওয়া
অনন্ত শৈশব –
রাত্রি দিন
আর তার পাতা দিয়ে
ঝরে পড়ে, নিয়ত
সহজ – সরল – কঠিন!
বিস্তর পরিচয়ে
অনন্ত দিন।।

পুজোর চিঠি

— শর্মিষ্ঠা আচার্য্য
(সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা, ২য় বর্ষ)

শরৎ মেঘে ভাসল ভেলা,
কাশ ফুলেতে লাগল দোলা;
ঢাকের উপর পড়ুক কাঠি,
পুজো হোক জমজমাটি;
ষষ্ঠীতে থাক নতুন ছোঁয়া,
সপ্তমী হোক শিশির ধোয়া;
অঞ্জলী দাও অষ্টমীতে,
আড্ডা জমুক নবমীতে;
দশমীতে হোক মিষ্টি মুখ,
মাগো তোমার স্পর্শ-সুখ
কাটায় জানি সকল দুখ।
আসছে পুজো বাজবে ঢাক
জীবন সবার সুখে থাক।।

আমার জন্মভূমি

— বিশ্বজিৎ ওঝা
(সাম্মানিক ইংরাজী অনার্স, ২য় বর্ষ)

আমার বাড়ি কোথায়?
সে যে তেপান্তরের মাথায়।
চাঁদ সূর্যের কিরণ মেলে হেথায়,
সাত সাগর আর তেরো নদী যেথায়।
নদী বয়ে যায় কুল কুল করে,
ঝরণা ঝরে অঝোর ঝরে।
শিশুরা এখানে খেলা করে,
আকাশ তার আঁচল মেলে ধরে।
ঘুম ভেঙ্গে যায় পাখির ডাকে,
চোখ খোলা থাকে গাছের ফাঁকে।
মাটি মেলে ধরে তার রঙিন শাড়ি,
খোলা আকাশের নীচে আমার বাড়ি।
এখানে বাতাস ভরে থাকে ফুলের গন্ধে,
মানুষ মেতে থাকে বাউল আর ভাটিয়ালির ছন্দে।
শরৎ-এ সাদা মেঘ উঠে,
বসন্তে কতো ফুল ফুটে।
মমতায় ভরা মায়ের স্পর্শ,
জন্মভূমি আমার ভারতবর্ষ।
মা যে আমার ধরিত্রি,
জন্মভূমি আমার বিশ্ব-প্রকৃতি।
নিজেকে উৎসর্গ করি মায়ের চরণে,
আজ বুঝেছি জীবনের মানে।

মা

— বিষ্টু ঘোষ
(কলাবিভাগ, ২য় বর্ষ)

জন্মদাত্রী মা আমার তোমায় ভালোবাসি।
সুখ-দুখে তোমার কাছে তাইতো ছুটে আসি।।
মা তোমার জন্য দেখেছি এ পৃথিবীর আলো,
জন্মদাত্রী মা তুমি সবার থেকে ভালো।।
কথা দিলাম তোমায় কখনো দেবো নাতো ফাঁকি।
ক্ষমা করে দিও যদি ভুল করে থাকি।।
মা গো আমি তোমার ছোট্ট সন্তান।
করিবোনা কখনো তোমারে অসম্মান।
মা গো তোমার ভালোবাসায় নেইকো ছলনা।
মা গো তোমার ভালোবাসার হয় না তুলনা।।

নিরাশা-র পৃথিবী

— অপর্ণা সুত্রধর
(স্নাতকোত্তর সংস্কৃত, ৩য় বর্ষ)

এক অসম্ভব পাওয়ার নেশায় হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে
ভেসে চলেছি কোন এক লক্ষ্যহীন পথের দিকে।
জানিনা কোন দিন খুঁজে পাবো কিনা এই পথের কিনারা,
নাকি সারাজীবন রয়ে যাবো এক উদ্দেশ্যহীন দিশাহারা।
হয়তো কোনদিন ছুঁতে পারবো না আমি স্বপ্নের মঞ্জিল,
হয়তো একদিন আসবে যেদিন হবো আমি আঁধারে বিলীন
এই পৃথিবীর সবকিছু আজ আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে,
আমি মরণের অপেক্ষায় রয়েছি এক মৃত্যু শিবিরে।
এই পৃথিবীতে আজ শুধু স্বার্থপর মানুষের ভীড়
এই পৃথিবী আজ ছল আর বিশ্বাসঘাতককতার নীড়।
দেখতে গেলে আজও আমার কাছে রয়েছে সবই,
তবু এই সবের মাঝেই দেখেছি এক লোভময় স্বার্থপর জগতের ছবি।
ভালোবাসা এখানে কল্পনা; ছল এখানে বাস্তব,
আজ আছে সবকিছু; কাল হারাবেই সব।
এখানে নেই কোন স্বপ্ন, বন্ধুত্ব, আশা ও ভালোবাসা
এ পৃথিবী আজ তপ্ত মরুভূমি, যেখানে রয়েছে শুধুই ধূ-ধূ নিরাশা।

Freshers' Day 2015

Youth Parliament '15
District Level
(1st Position)

Youth Parliament '15
Division Level
(2nd Position)

15th August & Subarna Jayanti Utsav

English Exhibition 2015

Freshers' Day 2015

গল্প

মা

— মহাদেব ঘোষ
(সাম্মানিক বাংলা, ২য় বর্ষ)

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি। অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে আমাদের জন্মদাত্রী মা-ই হল সবচেয়ে বড়। এই মা আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ, সাথের মানুষ, মনের মানুষ। মা তখনও কাঁদে যখন তার সন্তান খেতে পায় না, আবার মা তখনও কাঁদে যখন তার সন্তান সেই মাকে খেতে দেয় না। তবুও কিছু সন্তান অমানুষের মত ব্যবহার করে তার মায়ের সাথে। এখানে সেইরকম এক মা ও সন্তানের কথা লিখছি।

আউশ গ্রাম নামে কোনো এক গ্রামে আকাশ ও তার মা-বাবা বাস করত একটা ছোট্ট মাটির ঘরে। জমি-জায়গা বলতে আছে শুধু বিঘে দুই জমি। আকাশের বাবা ভ্যান চালায় আর তাঁর মা লোকের ঘরে কাজ করে। এই ভাবে তাদের সংসার চলে যায়। আকাশ খুব বুদ্ধিমান ছাত্র। বাবা-মা আধপেটা খেয়েও আকাশকে পেট ভরে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়েছে। এইভাবে আকাশ বড় হতে লাগল। যখন সে ক্লাস নাইন (নবম)-এ পড়ে তখন তার জন্ডিস হয়। তার কোনো বন্ধুই তার খোঁজ-খবর নেয়নি যে আকাশ কেমন আছে। মা-বাবা সারাদিন ভগবানকে ডাকে – আকাশকে সুস্থ করে দাও। পরীক্ষার দিন এসে পড়ে। আকাশ সুস্থ হতে না পারলেও বার্ষিক পরীক্ষাটা দেয়। এরপর আকাশের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। আকাশ টেনে-টুনে ক্লাস টেনে ওঠে।

এরপর আকাশ আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। যখন তার বয়স ১৯ বছর তখন সে কলেজে ভর্তি হল। এরপর হল এক অঘটন। আকাশ গণিত বিষয় নিয়ে সাম্মানিক বিভাগে ভর্তি হয়েছে। এরপর আকাশ এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ল। মেয়েটি হল অপূর্বা রায়। মেয়েটিও কিন্তু গণিত বিষয় নিয়ে সাম্মানিক (অনার্স) কোর্সে ভর্তি হয়েছে। দুজনেই এক বিভাগে পড়ে। অপূর্বাকে আকাশ খুব ভালোবেসে ফেলে। এরপর একদিন আকাশ অপূর্বার সামনে গিয়ে তার মনের কথা জানায়। এরপর আস্তে আস্তে তাদের সম্পর্ক গভীর হতে থাকে।

একদিকে আকাশের ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আর ছেলের হাবভাব দেখে তো অবাক হতেই হয়। আকাশ পড়াশোনায় ছিল খুব মেধাবী। তাই সে স্কলারশিপ পেয়েছে। আর সেই টাকায় তার পড়াশোনাটা অনেক সহজ হয়েছে। একজন শিল্পী যখন কোনো মূর্তি তৈরী করেন তখন মাটি, খড়, রং নানা উপকরণ দিয়ে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। একইভাবে আকাশের মা প্রতিমাদেবীও আকাশকে তিলে তিলে বড় করে তুলেছেন।

আকাশের যখন ২২ বছর বয়স তখন সে একটা চাকরী পেয়ে যায়। এরপর মা-বাবাকে জানায় তাদের সম্পর্কের কথা। তাদের দু'জনের বিয়েও হয়ে যায়। এরপর প্রতিমাদেবীর জীবনের (আকাশের মা) নেমে আসে এক অন্ধকার।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর অপূর্ব বলে যে আমরা দু'জন আলাদা থাকব। ছোট্ট অকাশ আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। আকাশ তার মা-বাবাকে জানিয়ে দেয় তারা শহরে গিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবে। আজ আকাশ অপূর্বার এককথায় রাখবে হাজার বাজি। অপূর্বার কথায় সে মরে যেতেও রাজি। কিন্তু সেই হতভাগিনী মায়ের একশো কথার মূল্য তার কাছে কিছুই নয়। আকাশ আজ বধিরের মতো শুনেও না শোনার ভান করছে।

আকাশ চলে যায় শহরে। এরপর ঘটল আর এক মহাবিপদ। আকাশের বাবা জগন্নাথবাবুর বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ভ্যান চালিয়ে জগন্নাথবাবু আকাশকে এতবড় করে তুললেন। আর আজ সেই

আকাশ তাদের ছেড়ে চলে গেল। একটা মেয়ের জন্য আকাশ আজ তার বাবা-মাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে চলে গেল। আকাশ অপূর্বার সাথে বেশ ভালোই আছে। কিন্তু বাবা-মার অবস্থাটা দেখার প্রয়োজনই মনে করেনি একবারও।

একটা মশা যখন একটা মায়ের বুকের উপর বসে সেই মশাটা কিন্তু মায়ের স্তন্য পান করে না। বরং তার রক্তটাই চোষে। এটাই চরম সত্য। প্রতিমাদেবী বহু কষ্টে আকাশের ফ্ল্যাট বাড়ীতে পৌঁছায়। তারপর আকাশ তার মাকে বলে – কেন এসেছো এখানে? আকাশ বলে – কি দিয়েছে আমায়, দু-বেলা দু-মুঠো ভাত। তাও আবার আধপেটা, এঁটো। লোকের বাড়ির এঁটো খাবার তুমি আমাকে এনে খাইয়েছো। আর আমাদের অপূর্বা দশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল নিয়ে এসে ছুঁড়ে দেয় প্রতিমাদেবীর মুখের উপর। হায়রে বিধাতা এই কি ছিল প্রতিমাদেবীর কপালে? প্রতিমাদেবী বলেন যে আকাশ আজ বউকে পেয়ে মাকে ভুলে গেলি! বা-রে বা! প্রতিমাদেবী আকাশকে আর অপূর্বাকে আসতে বলে একবারের জন্য। কিন্তু তারা কেউই আসে না। প্রতিমাদেবি টাকা না নিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসেন। এরপর কিছুদিন পর জগন্নাথবাবু বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

স্রোতের খেয়ালে নদীর তীরে ভেসে আসা প্লাস্টিক, জলে ভেসে আসা এঁটো পাতা, ছেঁড়া জুতো, শোলার সাদা কাগজ বিবর্ণ হয়ে পড়েই থাকে। কিন্তু জল বয়ে চলে আপন গতিতে। মানুষের জীবনেও একই পরিণাম ঘটে।

এই পৃথিবীতে আর কারোর চোখের জল ফেলালে কি হয় জানা নেই। তবে এটা বলতে পারি কোনো সন্তান তার মায়ের চোখে জল ফেলিয়ে সুখে থাকতে কোনোদিনই পারবে না। আর তাই হল। মাস দুয়েক পর আকাশের আবার সেই জন্‌ডিস হয়। আকাশের বউ অপূর্বা আকাশের যত্ন নেওয়ার কথা তো দূরের কথা একবার আকাশের দিকে তাকায়ও না। কেন জানো অপূর্বার জীবনে আজ আর এক নতুন মানুষ এসেছে যার অনেক অনেক টাকা আছে। আসলে কী বলতো অপূর্বা গণিত বিষয় নিয়ে স্নাতক হয়েছে। তাই টাকারঅঙ্কটা তার একটু কমই লাগছিল। তাই সে আজ আকাশকে পর করে দিয়ে আবিরের কাছে চলে গেল আবিরের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিতে।

মরুভূমিতে যখন কোনো মানুষ হাঁটে সেই মানুষটা ভাবে যে আর একটু দূরে গেলে সে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য জল পাবে। কিন্তু সূর্যের আলোয় মরুভূমির উত্তপ্ত বালি শুধুই চিকচিক করতে পারে, কোনো মানুষের তৃষ্ণা নিবৃত্তির ক্ষমতা কখনো মরুভূমির থাকে না। কারণ – অপূর্বা মন্দিরা, ইন্দিরা, টিয়া, প্রিয়া, রিয়া এরা নিজের জীবনটাকে যদি আকাশের মতো এত বড় জায়গায় নিজের স্থানটা না বুঝতে পারে, তাহলে আবির রং আর কতটুকু রাঙ্গাবে? যে আকাশে রামধনু দেখা যায় এরা সেই আকাশটাকেই চিনতে পারেনা। আকাশের বদলে যাওয়াটা শুধু অপূর্বার জন্যই।

এইভাবে, একদিন আকাশ প্রতিমাদেবীর কাছে চিঠি পাঠায়। প্রতিমাদেবী তার কাছে আসে, আকাশের সেবা করে আকাশকে সুস্থ করে তোলে। একটা নারকেলের উপরটা যতই শক্ত হোক না কেন, সেটা নাড়ালেই বোঝা যায় যে কতটা জল আছে। আর এই জলটাই কিন্তু আমাদের তৃপ্তি দেয়।

অন্যদিকে আমাদের অপূর্বা ম্যাডাম আবিরের কাছে চলে যায় নিজেকে আবিরের রং-এ রাঙাতে। আকাশ বুঝতে পারে আমরা ছেলেরা হলাম মোবাইল, আর অপূর্বার মতো মেয়েরা হল জল। জলটা মোবাইলে পড়ুক বা মোবাইলটা জলে পড়ুক ক্ষতিটা কিন্তু মোবাইলেরই হয়।

ভূমিষ্ঠ হবার পর কোনো পুত্র বা কন্যা যাইহোক না কেন সে মা বলে ডাকার চেষ্টা করে থাকে। অনুরূপভাবে আমরা যখন পৃথিবীর সব মায়া ত্যাগ করে সারাজীবনের

মতো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, তখনও কিন্তু মা ডাকটাই আসে। কোনো সন্তান ভুলে অপূর্বার মতো মেয়ে বা বউকে ডাকে না। (অপূর্ব বলে যদি কেউ এটা পড়ে থাকো বা এখানে ব্যবহৃত নামগুলির মধ্যে কোনো বন্ধু যদি থাকে তাহলে তাদের সাথে কোনোপ্রকার মিল থাকলে বন্ধু বলে ক্ষমা করে দিও।)

গাছের গোড়াটা যদি বটগাছের মত শক্ত হয় তাহলে গাছটা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না যদি সেটা কেউ না কাটে। প্রতিমাদেবীর শূন্য ঘরটা অপূর্বা যদি মনে করত তাহলে সেই দেবীর মন্দিরটাকে একটা মোমবাতির আলোকেই ভরিয়ে দিতে পারত। আকাশ তার মাকে বলে – মা ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিও। প্রতিমোদেবী বলেন – মানুষ যখন ভুল করে ফেলে তখন সেই ভুল রাস্তায় হাঁটা মানুষটার পথটা যখন শেষ হয় সেই শেষ প্রান্তে একটা মানুষ থাকে সে কে জানো? সে হল আমাদের 'মা'। তবে পৃথিবীর সব মেয়েই কি অপূর্বার মতো? তা নয়। ভালোবাসলে লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট-এর মতো ভালোবাসো।

আকাশ বুঝতে পারল যে সে যদি ঈশিতাকে ভালোবাসতো তাহলে আজ তার এই পরিণতি হত না। কারণ ঈশিতা আকাশকে সত্যিকারের ভালোবাসতো। আর আকাশ ঈশিতার ভালোবাসার কোনো মূল্যই দেয়নি। জীবনে যে সন্তান মায়ের ভালোবাসা বুঝতে পারে না, সে কি করে ঈশিতার মতো মেয়ের ভালোবাসার মূল্য দেবে!

প্রতিমাদেবীর মতো কত মা কষ্টে আছেন। অপূর্বার মতো মেয়ের জন্য । কারণ তাদের কাছে – "Everything is money, but I say all is 'love', because love is Divine"। কিন্তু ভগবান আকাশের সব ভুল ক্ষমা করে ঈশিতাকে আবার তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আকাশ মনে করল মাকে কষ্ট না দিলে ঈশিতাকে সে আরও অনেক আগেই পেত। আর এখন ঈশিতাকে পেল মাকে সত্যি করে ভালোবেসে মায়ের আসনে বসানোর জন্য। সে মনে করে যে মা-বাবার আশীর্বাদেই সে ঈশিতাকে আবার ফিরে পেল। এইভাবে তারা আবার নতুন করে সংসার শুরু করল। তাই বলছি আগে মা'কে ভালোবাসো, তাকে তার জায়গায় রাখো। তবেই ঈশিতার মতো মেয়েকে পাবে। বাবা-মাকে সুখে রেখো, ভুলে যেও না – "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি"।

"স্বার্থপরের মত বাঁচিয়া থাকা যেমন জীবনের লক্ষ্য নয়, তেমনই ইহা শিক্ষারও লক্ষ্য নয়।"

— নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রবন্ধ

নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভর দল

— অধ্যাপক রাতুল সাহা
(অর্থনীতি বিভাগ, সোনামুখী কলেজ)

আজ থেকে চার-পাঁচ দশক আগে পর্যন্ত কোনও দেশের জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজি ভালো-মন্দ পরিমাপের জন্য যে ধারণাগুলি প্রচলিত ছিল, তা হল সেই দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, দারিদ্র্য সীমারেখার উপরে বসবাসকারী মোট মানুষের সংখ্যা ইত্যাদি। কিন্তু এইসব সমষ্টিগত পরিমাপক যে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃত প্রতিফলক হতে পারে না, তা অনেক আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন। আর এইসব নতুন গবেষণার সূত্র ধরেই উঠে এসেছে নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য এবং নারীর ক্ষমতায়ন এর প্রসঙ্গটি।

এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন-এর নাম এসে যায়। তিনিই প্রথম দেখালেন যে, খাদ্যবন্টন থেকে শুরু করে শিক্ষা-সাক্ষরতা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকা – প্রায় সব দেশেই পুরুষের সাপেক্ষে নারীরা ধারাবাহিক বঞ্চনার শিকার। এই প্রবণতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত বা 'Sex bial / sex diffenential'। মেয়েদের বৈষম্যের কয়েকটি দিক নীচের সারণিতে তুলে ধরা হল।

।। সারণি – ১ ।।

মেয়েদের অবস্থানের কয়েকটি নির্বাচিত সূচক

সূচক	পুরুষ	মহিলা	তথ্যসূত্র
1. সাক্ষরতার হার (%)	82.14	65.46	জনগণনা - 2011
2. মাতৃমৃত্যুর হার (MMR), 2013 (প্রতি লক্ষ পিছু)	—	190	World Bank Report
3. নারী-পুরুষ অনুপাত	1000	940	জনগণনা - 2011
4. শিশুকন্যার অনুপাত (0–6 বছর)	1000	914	জনগণনা - 2011
5. জনসংখ্যায় কর্মীর অনুপাত (%) 2011	53.76	15.44	Office of the Registar General, India.
6. লোকসভার সাংসদ (%), লোকসভা-2014	87.85	12.15	—

ক্ষমতায়নের প্রাথমিক শর্ত হল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন, যা আসে রোজগার নিশ্চয়তার মাধ্যমে। অর্থনৈতিকভাবে সমাজে নারী প্রতিষ্ঠিত না হলে ক্ষমতায়নের সমস্ত তাত্ত্বিক কথাবার্তাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বিস্তীর্ণ অর্থে – ক্ষমতায়নের মূল বিষয়টি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পের সন্ধান বেছে নেবার স্বাধীনতা আর সেই সঙ্গে পারিবারিক ও সমাজজীবনে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অধিকার। এরজন্য ন্যূনতম শিক্ষা সচেতনতা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, নমনীয় শর্তে ঋণের সুযোগ ও নানা কর্মসূচির সুফল পাওয়ার সুযোগ

থাকাটাও ভীষণ জরুরি। সেই সঙ্গে সমষ্টিগত ক্ষেত্রে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সামাধানের অধিকার পাওয়াও সমানভাবে দরকার।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আমাদের দেশে দারিদ্র্য/বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন স্বনির্ভর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন – IRDP, DWCRA, TRYSEM, SITRA ইত্যাদি। প্রতিটি কর্মসূচীর কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি কর্মসূচীগুলির সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে অভিজ্ঞতার নিরিখে ১৯৯৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা চালু হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে স্ব-শক্তিকরণ করা। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ দেবার পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই ঋণ কোন ব্যক্তিকে না দিয়ে একটি গোষ্ঠী বা দলকে দেওয়া হয়ে থাকে। এই দল ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ থাকে আর এখান থেকে জেগে ওঠে দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা। কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড ১৯৯২ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ব্যাঙ্ক সংযোগ (SHG - Bank linkage) কর্মসূচী চালু করে পরীক্ষামূলক প্রকল্পরূপে।

আমাদের একটা সাধারণ ধারণা ছিল যে গরীবরা ঋণযোগ্য নয়, কারণ তাদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা নেই। এমনকি আমাদের দেশে বিভিন্ন গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরও আমরা দেখেছি এ ধরণের মানসিকতার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আর এ ধারণা পরিবর্তনের কৃতিত্ব অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুসের। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ অধ্যাপক ইউনুসকে খুব বিচলিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ্ডীর মধ্যে উন্নয়নের প্রথাগত তত্ত্ব মেলাতে না পেরে মানুষের সমস্যা বুঝতে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামটিকে পরীক্ষামূলকভাবে বেছে নিয়েছিলেন উন্নয়ন কাজের জন্য। তিনি দেখলেন জোবরা গ্রামের মেয়েরা বাঁশের কাজ করে দৈনিক দশ আনা আয় করত। বাঁশ কেনার ৫ টাকা না থাকায় ব্যবসায়ীদের কাছে হাত পাততে হত। পরবর্তীকালে তাদের তৈরি দ্রব্য অল্পদামে ঐ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতে হত। এরকম ৪২ জন দুস্থ মহিলার একটি তালিকা তিনি তৈরি করলেন। তারপর নিজের আয় থেকে ৪টি টাকা ধার দিলেন, পরবর্তীকালে তারা সুবিধামত শোধ করে দিল। এভাবে মহাজনদের জাল থেকে গ্রামবাসীদের মুক্ত করে তিনি বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। তিনি গরীব মানুষকে seller of labour থেকে seller of goods -এ রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়েই এই পথের সন্ধান দিলেন।

অধ্যাপক ইউনুস প্রমাণ করেছেন যে নিজ উদ্যোগ ও সদিচ্ছা থাকলে গরীব মানুষ নিজেরাই গ্রাম্য শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করে তাদের সার্বিক উন্নতি করতে পারে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চিন্তাধারা আজ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। "বিশ্বব্যাঙ্ক" এটিকে মডেল হিসেবে মেনে নিয়েছে।

প্রকৃতিগত কারণে দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সংগ্রামে মহিলাদের কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে তাদের জীবন তুলনামূলকভাবে গণ্ডীবদ্ধ। শহরবাসী মহিলাদের ক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ জীবনের বাইরে এসে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা তৈরি করা সহজ। কারণ এর জন্য যে কটি উপাদান দরকার সবকটিই শহরজীবনে অনেকটা সহজলভ্য। যেমন – তুলনামূলক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষার সুযোগ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদি। ফলে, মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে শহর কিছুটা এগিয়ে। কিন্তু গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে এসব অপ্রতুল বস্তুত দুর্লভ। তাই ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ মহিলা সমাজ অনেক পিছিয়ে। যদিও কি শহর কি গ্রাম সামগ্রিকভাবে মহিলারাই অসাম্য ও বঞ্চনার শিকার।

আমাদের সমাজ পুরুষশাসিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীকে কোনও না কোন ভূমিকায় পুরুষের আশ্রয় এবং নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। যুগ যুগ ধরে এই দৃষ্টিভঙ্গি মহিলাদের চেতন, অবচেতন মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। মহিলারাও নিজেরা মনে করে ছেলেদের জগৎ

বাইরে, মেয়েদের জগৎ ঘরে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জন্মায় নারী-পুরুষে অর্থনৈতিক অসাম্য ও সামাজিক অসাম্য। এই অসাম্য জড়িয়ে পড়ে পারিবারিক জীবনেও। মেয়েদের নিজেদের প্রতি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারলে অবশ্যই তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটবে এবং ক্ষমতায়নও সম্ভব হবে। ক্ষমতা বাইরে থেকে কাউকে দেওয়া যায় না। ক্ষমতা নিজেদের অর্জন করতে হয়। ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে যে মানসিকতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মহিলাদের তা ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং জোট বাঁধতে হবে। গ্রামে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি মহিলাদের জোটবদ্ধতা তাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে কি বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ্রামীণ মহিলাদের জোটবদ্ধ করার কাজটা প্রথমে একদম স্থানীয়ভাবে করতে হবে। এ কাজটা শুরু করা যেতে পারে স্বনির্ভর দল গঠনের মধ্য দিয়ে।

স্বনির্ভর দল কি?

নিজেদের উন্নয়নের জন্য সম আয় সম্পন্ন, সম মনোভাবাপন্ন ৫-২০ জন গরীব মানুষ দলবদ্ধ হবে এবং নিয়মিত সঞ্চয় করবে। সঞ্চয়ের টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে হবে দলের নামে। এইভাবে দলের নিজস্ব তহবিল গড়ে ওঠে। তহবিল থেকে বিপদে টাকা ধার নেবে অথবা রোজগারের উপায় করবে। দল ঠিক সব চললে ব্যাঙ্কের এবং সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে। ফলে তারা অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারবে।

কেন স্বনির্ভর দল?

সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, পারিবারিক ক্ষেত্রে অবহেলা গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের জীবনে অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এসবের বিরুদ্ধে একা একা কেউ লড়াই করতে পারে না। লড়াই করতে হলে একজোট বা সঙ্ঘবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু গ্রামীণ জীবনে কে তাদের একজোট করবে? কে মহিলাদের নিয়ে এরকম লড়াকু সংগঠন গড়ে তুলবে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। শুধুমাত্র মহিলাদের প্রতি অবিচারকে সামনে রেখে গ্রামীণ সমাজে সংগঠন গড়া সম্ভব নয়। গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ধ্যানধারণা, জীবনবোধ সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজকর্মকে কেন্দ্র করে মহিলাদের দলবদ্ধ করা সম্ভব। তাদের দলবদ্ধ করে স্বনির্ভর দল গড়ে তুলে তার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা মোটেও কঠিন নয়। আর এই লড়াই-এর মধ্য দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে।

স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিকগুলি নীচে তুলে ধরা হল ঃ—

(১) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন :

দারিদ্র্য মোচন সম্ভব না হলে সাধারণভাবে ক্ষমতায়নের প্রশ্নই অবান্তর। আদর্শ অর্থনৈতিক মডেলের সফল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নারী যে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে, ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ এশিয়ায় তার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও স্বয়ম্ভর ব্যাঙ্ক সংযুক্ত প্রকল্প প্রায় ১২ কোটি দরিদ্র পরিবারকে দারিদ্র্যমুক্ত করেছে। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তো সেখানকার নারীদের ঘরের চার দেয়াল থেকে বার করে এনে আদর্শ আর্থিক ক্ষমতায়নের 'রোল মডেল' হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে নিজেদের তহবিল বা সঞ্চয় গড়ে ওঠার ফলে কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা তাদের জীবনে এসেছে। গ্রামীণ মহাজনের কাছে হাত পাততে হয় না। এটা তাদের সাহসী করে তোলে এবং প্রতিবাদী হতে শেখায়। দলের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়ে তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে অথবা ডেয়ারি, মুড়ি তৈরি, ফসলের চাষ ইত্যাদি করে দলের

সদস্যরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল করেছে। অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা দু'-চারটে হাঁস মুরগী, গরু বা ছাগল পুষে সংসারের কিছুটা সুরাহা করছেন। তাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, সচেতনতা বেড়েছে। পুরুষ মানুষের মত তারাও যে সমান দক্ষতায় বাইরের কাজ করতে পারে, রোজগার করতে পারে এই বিশ্বাস এসেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে তারা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে।

(২) পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন :

পুরুষের সাপেক্ষে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ও ঘরের বাইরে বিভিন্ন উপলক্ষে যাওয়া আসার ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনতার (freedom of movement) কথা।

দশ পনের জন মহিলা মিলে দল গঠন করছে। তারা প্রতি মাসে একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছে। সেই টাকা তারা দলের নামে ব্যাঙ্কে রাখছে। এর আগে তাদের কোন সঞ্চয় ছিল না। কোনও দিন ব্যাঙ্কেও যায়নি। এমন মহিলাদের নিজেদেরই ব্যাঙ্কে যেতে হয় টাকা তুলতে, টাকা জমা দিতে। ব্যাঙ্ক কর্মীদের সাথে কথা বলতে হয়। আগে তাদের স্বামীর সঙ্গ ছাড়া বার হবার ক্ষমতা ছিল না, এখন তারা একা একা অথবা দল বেঁধে শহরের ব্যাঙ্কে গিয়ে লেনদেন করছে। বাইরের জগৎ দেখছে। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। দল করার পর মহিলারা সংসার জীবনেও অনেক গুরুত্ব পাচ্ছে। পারিবারিক জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করছে। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, রোগ হলে চিকিৎসা এ ব্যাপারে মহিলাদের মতামত গ্রাহ্য হচ্ছে। কারণ, তাদের নিজস্ব অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। আগে যেখানে স্বামীদের কাছ থেকে তারা অবহেলা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও পেতেন এখন তারা স্বামীদের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং রোজগেরে বউ হিসাবে মর্যাদা পাচ্ছেন। স্বামীর প্রয়োজনে তারা দল থেকে ঋণ নিয়ে সাহায্য করছেন। এভাবে একমুখী নির্ভরশীলতার বদলে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরি হচ্ছে।

অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার হাত ধরে মহিলারা সামাজিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে গিয়েছে। আগেই বলেছি নিজস্ব অর্থনীতি ও সঙ্ঘবদ্ধতা তাদের সাহসী করেছে, প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছে। সমাজে তাদের একটা পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকারি আধিকারিকদের কাছ থেকে তারা গুরুত্ব পাচ্ছেন। দলের মহিলারা বিভিন্ন ট্রেনিং নিচ্ছেন, পঞ্চায়েত বা ব্লকস্তরে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছেন, Mid-day meal -এর রান্না করছেন। সমাজে ওঁদের মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে। বেশ কিছু দল যারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রকল্প ঋণ পেয়েছে এরা বড় বড় অর্থনৈতিক কাজকর্ম শুরু করেছে। এভাবে ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটছে। মহিলাদের প্রতি সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরা সমবেতভাবে লড়াই করছে আগে যেটা সম্ভব ছিল না। দল গড়ে জোটবদ্ধ হবার ফলে তা সম্ভব হয়েছে।

৩) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন :

বর্তমান মুহূর্তে একথা সর্বস্তরে স্বীকৃত যে 'পঞ্চায়েত' মানুষের প্রতিষ্ঠান। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিচালনায় গ্রামোন্নয়নের কাজে নেতৃত্ব দেবার সার্বিক দায়িত্ব পঞ্চায়েতের জনগণের সহায়তায় জনগণকে সঙ্গে নিয়েই পঞ্চায়েত এই নেতৃত্ব দেবার কাজটি করবেন। এরজন্য প্রয়োজন সচেতন জনগণ, সচেতন মানুষ সক্ষম জনগোষ্ঠী, আত্মবিশ্বাসী গ্রামবাসী। এটি একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া। একদিকে পঞ্চায়েতে গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত হবে, অন্যদিকে গ্রামের মানুষকেও এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে – উন্নয়নের সুফল ভোগ করার জন্য, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য, গ্রামের উন্নয়ন কর্মসূচি

রূপায়ণ ও তদারকিতে অংশগ্রহণ করার জন্য।

এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ মানুষের সংগঠন বা স্বনির্ভর দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বনির্ভর দলগুলির মূল জনগোষ্ঠীরই অংশ। দৈনন্দিন প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই এই সংগঠিত হবার কাজ শুরু করা সহজ, শুরু সংসদ এলাকায় গড়ে ওঠা 'স্বনির্ভর দল' (মহিলা এবং পুরুষ) গুলিই হবে জনগণের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জনগণেরই সংগঠন। 'স্বনির্ভর দল' ভুক্ত হয়ে দরিদ্র অসহায় মানুষ সক্ষমতা অর্জনের ধারাবাহিক মাধ্যমে পাবেন এই আশা করা যায় এবং এর মত অন্য কোন স্থায়ী বিকল্প ভাবাও কঠিন। স্বনির্ভর দলগুলিই হবে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরির কাজে অন্যতম হাতিয়ার। অন্যদিকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে নেওয়া উদ্যোগগুলি রূপায়ণ ও তদারকির দায়িত্ব পালনেও এই 'স্বনির্ভর দলগুলিকেই' যুক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রাম সংসদ স্তরে যতগুলি স্বনির্ভর দল আছে তাদেরকে একই ছত্রছায়ায় এনে উপসংঘ এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর দলের সংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের অনেক পথ চলা বাকি রয়েছে।

পঞ্চায়েত, পৌর প্রশাসন সহ তৃণমূলস্তরে গত দুই দশক ধরে নারীর অধিকতর আনুপাতিক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সাধারণভাবে এরকম একটি ধারা প্রচলিত আছে যে, পুরুষতান্ত্রিক কৃতিত্ব বা নেতৃত্বের তুলনায় নারীদের হাতে দায়িত্ব এলে গোটা প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত হবে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন দুর্নীতি বা বিচ্যুতির অবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এর একটি কারণ হিসেবে বলা যায় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের স্বামী বা অন্যান্য পুরুষ রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন।

নারীর ক্ষমতায়ন : শেষের কথা

মেয়েদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেই হবে না, ক্ষমতাকে যাতে তাঁরা সঠিকভাবে, সঠিক জায়গায়, কাজে লাগাতে পারেন তার জন্য মেয়েদেরকে তৈরি করতে হবে। ক্ষমতা পাওয়া এক জিনিস আর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার আর এক জিনিস। তাই প্রথাগত শিক্ষাই হোক অথবা প্রয়োজনের ভিত্তিতে কার্যভিত্তিক শিক্ষাই হোক মেয়েদের আগে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে গান্ধিজীকে স্মরণ করে বলতে পারি, "If you educate a man, you deucate an individual, but if you educate a woman, you educate an entire family."। জওহরলাল নেহেরুও বলতেন – "You can tell the condition of the nation by making at the status of women"। এ ব্যাপারে সরকারি আধিকারিকগণকে, NGO, পঞ্চায়েতকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ওঁরা স্বনির্ভর দলগুলির লালন পালন থেকে দলের সংখ্যা বাড়াতেই বেশি আগ্রহী। ভারতীয় নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন পর্ব এখনও রয়েছে তার শৈশব অবস্থায়। তবে ধীরে হলেও এই প্রক্রিয়া যে পথ চলা শুরু করেছে, তাই যথেষ্ট আশা জাগায়। আগামী দিনে নারীর অবস্থা আরও উন্নত হবে — এ আশা আমরা অবশ্যই করতে পারি।

তথ্যসূত্র :– (1) ড. অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় (২০১২) : নারীর ক্ষমতায়ন – ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, যোজনা, জুন।
(2) শাশ্বতী ঘোষ (২০১২) : আমরা-ও পারি? নাকি, আমরা-ই পারি?, যোজনা, জুন।
(3) Sen. M (2005): Study of self Help Groups and Micro-Finance in West Bengal, SIPRD, Kalyani.
(4) Khandker S.R. (1999): Fighting Poverty with Microcredit: Experience in Bangladesh. Oxford University Press, New York.

গল্প

ঝন্টিপাহাড়ীতে ঝঞ্ঝাট

— অয়ন দাস
(বিজ্ঞান বিভাগ-জেনারেল, ২য় বর্ষ)

গতবারের গরমের ছুটিতে ভাবলাম চার বন্ধু – জগা অর্থাৎ জগন্নাথ, আমি অর্থাৎ অয়ন, সোমে অর্থাৎ সোমনাথ এবং অভিজিৎ অর্থাৎ অভি কোথাও বেড়িয়ে আসব। চাঁদুদের রোয়াকে বসে যখন এসব কথা চিন্তা-ভাবনা করছি। তখনই সেখানে এসে উপস্থিত হল জগাদ দাদা সমীর। সে আমাদের বলে, "কী রে, তোরা এখানে বসে কী বিষয়ে আলোচনা করছিস।" আমি বললাম, "সমীরদা আমরা ভাবছি যে, আমাদের সকলেরই এখন কলেজ ছুটি আছে, তাই কোথাও যদি ঘুরতে যাওয়া যেত তাহলে বড় ভালো হত।" খুব খুশী হয়ে সমীরদা বলল – "আরে, ঘুরতে যেতেই যদি চাস তাহলে যা না ঝন্টিপাহাড়ী বেড়িয়ে আয়। ওখানকার আবহাওয়া খুবই মনোরম। আমি ঐখানে পড়াই, আমি যেখানে গিয়ে থাকি, সেই বাংলোতেই তোদের থাকার ব্যবস্থা করে দেব, তাহলে তো আর কোনো অসুবিধা থাকবে না।" আমি ও বন্ধুরা খুশী হয়ে বললাম, "কবে যাব তাহলে?"। সমীরদা বলল – "আগামী কালই যেতে পারিস, ঠিক আছে তোরা সোমবার যাস।"

সোমবার দিন সকাল সাতটায় ট্রেন, স্টেশনে সকলে পৌঁছে গেছি কিন্তু সোমে অর্থাৎ সোমনাথ পৌঁছায়নি। তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমিই রওনা দেব এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে সোমনাথ এল স্টেশনে। আমি বললাম – "বাঁদরামি করার আর জায়গা পেলি না। শেষমেষ তোর জন্যই আজ ট্রেনটা মিস্ করতাম বুঝলি।" সে বলল, "মা, বাবা খুব দেরি করে ঘুম থেকে আমাকে তোলায় তৈরী হয়ে আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল রে। আর হবে না। কথা দিচ্ছি।"

ট্রেনে যখন উঠেছি তখন তেমন কোনো মজাদার প্যাসেঞ্জার ছিল না। কিন্তু পরের স্টেশনে এক সাধু ও তার সাগরেদ উঠল আমাদের কামরায়। সাধুর চেহারা খুবই হৃষ্টপুষ্ট আর তাঁর চ্যালার চেহারা প্যাকাটির মতো সরু, লিকলিকে। সাধু মহারাজের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম তাঁর নাম স্বামী ঘুটঘুটানন্দ এবং তাঁর শিষ্যের নাম সান্তারাম। নামের মতোই চেহারা স্বামীজির। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মতো ঘুটঘুটে কালো বর্ণের চেহারা তাঁর। বেজায় রাগী তিনি। অভিজিৎ ভুল করে ওনার আনা মাটির হাঁড়িটা স্পর্শ করতেই উনি চেঁচিয়ে ওকে বললেন, "পাপী, নরাধম, ঐ মায়াবী হাঁড়ি তুই স্পর্শ করিস, তুই নরকে যাবি।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সাধু মহারাজ আপনার সঙ্গে যে হাঁড়িটা যাচ্ছে তাতে কী আছে? সাধু গম্ভীরস্বরে বললেন, "ঐ মায়াবী হাঁড়িতে কিছু বিষধর সাপ আছে। ঐ হাঁড়ির কাপড় যেন খুলো না। খুললেই মহা বিপদ। ঐ সাপগুলি ভীষণ ভয়ানক কিন্তু।"

সকাল গড়িয়ে বিকেল হল। আমি ঘুমাইনি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে এবং পরে রাত হল। রাত্রে আমি সব বন্ধুদের ডেকে তুললাম। বললাম, "চল্, স্বামীজি ঘুমোচ্ছেন। এই সুযোগে দেখি হাঁড়ির ভিতর আছেটা কী?" সোমনাথ ভয় পেয়ে বলল, "কী দরকার তোর হাঁড়ির কাপড় খোলবার? দরকার নেই, বাদ দে, চল্ ঘুমিয়ে পড়া যাক। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে"। আমি বললাম, "তোর ঘুম পেলে ঘুমা, আমি আজ দেখবই কী আছে ওতে।" হাঁড়ির বাঁধনটা খুলতেই দেখি এক হাঁড়ি মিষ্টি। লোভ সামলাতে না পেরে সকলকে ডেকে সব মিষ্টিই খেয়ে ফেললাম, শেষে সব মিষ্টি খাওয়া হলে, হাঁড়িটা যেমন ছিল তেমন দিলাম রেখে।

স্বামীজী আমাদের অনেকক্ষণ আগে বলেছিলেন, "আমি বড়ই ক্লান্ত, তা একটু দিবানিদ্রা দিই, আমার গন্তব্য এলে আমাকে ডেকে দিও।" তা আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাঁর স্টেশন চক্কর চলে আসায় সান্তা

তাকে ডেকে তোলে ও তারা দুজনে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। নেমে গিয়ে সাধুর মনে পড়ে তাঁর মিষ্টির হাঁড়ির কথা। তিনি বলেন, "আমার মিষ্টির হাঁড়ি কই?" তখন আমিও "মিষ্টির হাঁড়ি নয় গুরুজী, বিষধর সাপে ভর্ত্তি মায়াবী হাঁড়ি" বলে ফাঁকা কিন্তু রসে ভর্ত্তি হাঁড়িটা বাইরে ছুড়ে দিলাম। গালি-গালাজ শুনতে শুনতে স্টেশন ছাড়িয়ে চলে এলাম আমাদের গন্তব্য ঝন্টিপাহাড়ীতে।

সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে এসে পৌঁছালাম ঝন্টিপাহাড়ীতে। ঝন্টি পাহাড়ী গ্রামটি বড়ই শান্ত, পরিবেশ খুবই মনোরম, আরামদায়কও বটে। সকালে স্টেশনে পৌঁছেও তেমন কোনো গাড়ি পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম, এখন কোনো গাড়ি হয়তো পাওয়া যাবে না। কারণ গ্রামের দিকে মোটরগাড়ি পাওয়া খুবই দুষ্কর। হঠাৎ দেখি একটা লোক গোরুর গাড়ি নিয়ে স্টেশন চত্বরের বাইরে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে আমরা তার কাছে ছুটে যাই মালপত্র নিয়ে এবং বলি, "এই যে ভায়া, রায়েদের বাংলো যাবে?' সে বলল, "ঐ ভূতুড়ে বাড়িতে কেন যাবেন আপনারা? আমি নিয়ে যেতাম না, কিন্তু সকালবেলা বলে যাচ্ছি। কিন্তু আপনারা চারজন গেলে এ গাড়িতে হবে কী?" আমরা বললাম, "খুব হবে। খুব হবে। চলো চলো।" গরুর গাড়িতে করে প্রায় ১০টার সময় পৌঁছালাম বাংলোতে।

বাড়ির এক কাজের লোক ছিল, নাম তার হরি। লোকটি খুবই শান্ত স্বভাবের। আমরা ভীষণ ক্লান্ত দেখে আমাদের শোবার জায়গা দেখিয়ে দেয় ও বলে, "বাবুরা, সমীরবাবু আমাকে আপনাদের দেখাশোনা করতে বলেছেন। আপনাদের জন্য জলখাবার আনছি এক্ষুণি।" জলখাবার খাওয়া হলে সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, "তা বাবুরা আজ আপনারা দুপুরে কী খাবেন মাছ-মাংস না ডিম।" আমি বললাম, "পাঁঠার মাংস খাব বুঝলে, অনেকদিন কব্জি ডুবিয়ে খাইনি। আজ খাব, বেশ জম্পেস করে রাঁধো দেখি।" সে বলল, "ঠিক আছে বাবু তাই হবে।"

দুপুরে খাবার সময় হরিদাকে বললাম, "হরিদা, তোমার রান্নার হাত কিন্তু চমৎকার একেবারে চেটে পুটে খেলাম। খাওয়াটা বোধ হয় একটু বেশিই হয়ে গেল। দিবানিদ্রা দেবার পর ভাবলাম জায়গাটা খুব ভালো করে দেখে এলাম। কী অপূর্ব জায়গা। দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়।

তারপর দু'-চারদিন বেশ নিশ্চিন্তেই কাটল। কিন্তু তারপর একদিন রাতে .....। অভিজিতের ঘুম ভেঙে যায় খট্‌খট্ শব্দে কে যেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। আমাদের সবাইকে ডেকে তোলে ও। কিন্তু বাইরে তো কেউ নেই। কেবল জোরে বাতাস বইছে মাত্র। পরদিন সকালে হরিদাকে জিজ্ঞাসা করি, "কী ব্যাপার গো হরিদা।" হরিদা শুনে ভয় পেয়ে, "এ এ ....."। আমি বললাম, "কী হল, কী হল হরিদা"। সে বলল "এ নিশ্চয় সেই ভূত।" আমি ও বন্ধুরা অবাক হয়ে বললাম, "ভূত! কোন ভূত? কে সে? তুমি তাকে দেখেছ হরিদা?" হরিদা আরও ভয় পেয়ে, "এ বাড়িতে সম্ভবত কোনো ভূত আছে। তাই রাত্রিবেলা আমি বাড়ি ফিরে যাই।" বন্ধু সোমনাথ তখন বলল "হ্যাঁ, ঐ গরুর গাড়ির চালকও বলেছিল যে, এই বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব। এখন দেখছি তাই সত্যি।"

আমি এসব কথা ঠিক হজম করতে পারলাম না। ঠিক করলাম এ ভূতের খবর নিতে হচ্ছে। পরদিন সকালে চারজন ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। হরিদাকে ডাকতে যাব, তখন আমার পায়ের কাছে একটা কিছু লাগে। সেটা নীচ থেকে কুড়িয়ে নিলাম এবং দেখলাম ভিতরে একটা ইঁটোর টুকরো এবং সেটা দিয়ে মোড়া কাগজটা খুলতেই দেখি ওতে কী যেন লেখা, "তোমরা যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও, নইতো তেমাদের কপালে অশেষ দুর্গতি।" চিঠিটা বাকিদের দেখাতেই ভীতু অভিজিৎ "আমি বাবা কালই এখান থেকে কেটে পড়ব। ছুটি কাটাতে এসে শেষে ভূতের খপ্পরে পড়ি আর কী?" আমি তখন মনে মনে

ভাবছি "এভাবে পালালে চলবে না। আমরা কুম্ভবাজারের ছেলে, আমরা এভাবে কাপুরুষের মতো কিছুতেই পালাবো না।"

পরদিন থেকেই প্রত্যেকেই খুব সতর্ক হয়ে আছি। সক্কাল সক্কাল বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাংলোর চারপাশের জঙ্গলটা ভালো করে লক্ষ্য করতে শুরু করলাম। যদিও সন্দেহজনক তেমন কিছু লক্ষ্য করলাম না। অভিজিৎ কী যেন দেখতে গিয়ে আমাদের সঙ্গছাড়া হয়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন সময় দেখি সোমনাথও উধাও। আমরা সোমনাথ ও অভিজিতের খোঁজ করতে লাগলাম। কোথাও খুঁজে পেলাম না ওদের তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও। হঠাৎ জঙ্গালেরই একটা ঝোপের ধার থেকে খুঁজে পাওয়া গেল অভিজিৎকে। সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেখানে। তাকে ডেকে তার জ্ঞান ভাঙাতেই সে বলল যে সে ভূতের দাড়ি ছিড়েছিল বলে রেগে সেই ভূত তার গালে একচড় কষিয়ে দেয়। ভাবলাম অভি বোধ হয় ভুলভাল বকছে। কিন্তু তার হাতে ঘন সাদা একগোছা চুল দেখতেই তার কথাগুলো সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল। যাইহোক, অভিকে নিয়ে আবার আমরা সোমনাথের খোঁজ করতে শুরু করলাম। এমন সময় জঙ্গালের একটা গাছে একটা ফল দেখতে পাই। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত ছিলাম। সকাল থেকে একটা দানাও আজ পেটে পড়েনি। তাই ছুটে গেলাম ফলের কাছে। যাবার সময় সবুজ পাতা আচ্ছাদিত একটা খালের ভিতর পড়ে যাই আমি। সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম ভাবি বুঝিবা মারা পড়েছি। কিন্তু দেখলাম না, আমি বেঁচে আছি এবং আমার পাশে সজোরে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে বন্ধু সোমে অর্থাৎ সোমনাথ। তাকে ডেকে তুলতেই সে আমার উপর চড়াও হল। সে বলল, "দিলি তো দিলি তো ঘুমটা আমার ভাঙিয়ে। কি সুন্দর দিবানিদ্রা দিচ্ছিলাম, সবে চোখটা লেগেছিল"। আমি তখন "তোর চোখ না আমি গেলে দেব। আমরা তোকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে। আর উনি এখানে দিবানিদ্রা দিচ্ছেন, মর্কট্ কোথাকার। চল্ চল্ এখান থেকে বেরোই তো আগে, তারপর তোর সব কথা শুনছি।" সোমনাথ বলে উঠল, "না অমি যাব না"। আমি বললাম, "কেন? যাবি না কেন শুনি?" সে বলল, "আমি এখানে খুব ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি, দিবানিদ্রা দিচ্ছি। আমি কোনো অবস্থাতেই যেতে চাই না এখান থেকে।" আমি বললাম, "রাখ্ তো তোর ঘুম। আমরা এদিকে হেদিয়ে মরছি, ওনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর উনি কিনা ভালো ভালো খাবার গিলছেন। চল্, আমার সঙ্গে নইলে তোকে ফেলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব।" তখন নিরুপায় হয়ে সোনাথ সম্মতি জানাল, "ঠিক আছে, চল্।"

এমন সময় প্যাকাটির মতো চোহারা নিয়ে হিন্দু বুলি ঝাড়তে ঝাড়তে এলো একটা লোক। "এ, বাবু তুম ইঁহা ক্যায়সে আয়া?" লোকটার কণ্ঠস্বর খুবই চেনা লাগল আমাদের, বিশেষ করে আমার। অন্ধকার থেকে সে যখন আমাদের সামনে এল, তখন তাকে দেখে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম্। "এ তো সেই সান্তারাম। ট্রেনে যে সাধু মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার চ্যালা।" মনে মনে বললাম। সান্তারামের পেছন পেছন আসছিলেন গুরুজী অর্থাৎ, স্বামী ঘুটঘুটানন্দ। তাকে দেখে একটু অবাক লাগল। কারণ তিনি কেন জানিনা গালে হাত দিতে দিতে আসছিলেন। পরে উনিই বললেন, "তোদেরই এক মর্কট, কী যেন নাম, অভিজিৎ, ঐ ছোকরাটা, ব্যাটা আমার দাড়ি ছিঁড়েছে, ওটাকে ছাড়ছি না। ধরতে পারলেই আস্ত চিবিয়ে খাব। তখনই ধরতুম ব্যাটাকে কিন্তু ব্যথার চোটে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর তোদেরও ছাড়ছি না, সান্তা ধর তো ব্যাটারে।" তখন আমি সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে কোনো মতে ওদের দুজনের হাত থেকে বাঁচি।

হাঁপাতে হাঁপাতে দুজনে এসে পৌঁছালাম বাকি দু'জনের কাছে। জগা অর্থাৎ জগন্নাথ বলল, "কোথায় ছিলি অয়ন? সোমেকেই বা কোথায় পেলি তুই?" আমি বললাম, সব বলছি, সব বলছি। আগে একটু জিরিয়ে

প্রবন্ধ

যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা

—বৈকুণ্ঠ মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ),
সোনামুখী কলেজ

ভারতে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হল আইন বিভাগ। আইন বিভাগের দুটি কক্ষ আছে। উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভা। এই দুটি কক্ষকে নিয়ে ভারতের পার্লামেন্ট বা সংসদ গঠিত হয়। রাজ্যসভা গঠিত হয় ২৫০ জন কে নিয়ে। এর মধ্যে ২৩৮ জন নির্বাচিত হ'ন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে এবং ১২ জন রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হোন শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ থেকে। অপরদিকে লোকসভা গঠিত হয় মোট ৫৫২ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৫৩০ জন নির্বাচিত হ'ন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে, ২০ জন নির্বাচিত হোন বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে এবং ২ জন রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হোন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে থেকে।

এই পার্লামেন্ট বা সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হয় বছরে ২ বার যথা শীতকালীন অধিবেশন এবং বাদল অধিবেশন। একটি অধিবেশন শেষ হওয়া থেকে অপর অধিবেশন শুরু হওয়ার মধ্যে ৬ মাস ব্যবধান থাকতে হয়। এছাড়া অনেক সময় বিশেষ অধিবেশনেও ডাকা হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে লোকসভাতেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল আলোচনা করা হয়। লোকসভা মূলত গঠিত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। যাদের আমরা সাংসদ বলে থাকি। এই সাংসদ-রা প্রথম অধিবেশনে নিজেদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার এবং একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করে।

সংসদের অধিবেশন চলাকালীন প্রত্যেক দিনের কার্যাবলীকে কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়। যথা – (১) শপথ গ্রহণ (২) প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (৩) প্রশ্নোত্তর পর্ব (৪) মুলতুবি প্রস্তাব (৫) দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাব (৬) উল্লেখ পর্ব (৭) জিরো আওয়ার (৮) অনাস্থা প্রস্তাব (৯) বিল উত্থাপন ইত্যাদি।

নতুন সদস্যের শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। এরপর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কারণে মারা গেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে যে সকল প্রশ্ন স্পীকারের কাছে জমা পড়েছিল তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। এই প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে, যে সকল বিষয় কার্যবিধিতে থাকেনি কিংবা হঠাৎ বিশেষ কারণে আলোচনার প্রয়োজন আছে সেইসব বিষয় মুলতুবী প্রস্তাব আকারে আলোচিত হয়। এরপর একে একে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এবং উল্লেখ পর্বে যে সকল বিষয় স্পীকারের কাছে পূর্ব থেকে জমা পড়েছিল সেইগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারপর শুরু হয় জিরো আওয়ার। এই সময় এমন কিছু প্রকরণ বিধি কাজকর্ম হয় সেগুলির জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ধরা থাকে না। এরপর অনাস্থা প্রস্তাব এবং বিল উত্থাপনের মধ্য দিয়ে সংসদের কার্যাবলী শেষ হয়।

ভারত সরকার এই সংসদ বিষয়ক ধারণাকে সমগ্র সমাজে চড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করে, যা পার্লামেন্ট অ্যাফেয়ার্স কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটি বিচার-বিবেচনা করে তা বিদ্যালয় এবং কলেজগুলিকে যুব সংসদ নামে প্রকল্প চালু করে। বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও

প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ও কলেজগুলিতে আবশ্যিকভাবে এই প্রকল্প চালু করেছে। এছাড়া বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য বর্তমানে রাজ্যসরকার আর্থিক পুরস্কার ও ঘোষণা করেছে।

এই যুব সংসদ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংসদ বিষয়ক ধারণা দেওয়া যেমন সম্ভব হয়েছে তেমনি তাদের আগ্রহ কেউ বাড়িয়ে তোলাও সম্ভব হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার যে সকল মহাবিদ্যালয়গুলি আছে তারমধ্যে যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় সোনামুখী কলেজ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সোনামুখী কলেজ জেলা স্তরের যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় ২০০৭-২০০৮, ২০১২-২০১৩, ২০১৪-২০১৫ সালে প্রথম স্থান এবং ২০১২-২০১৩ ও ২০১৪-২০১৫ সালে ডিভিশনাল যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত পুরস্কার ও পেয়েছিল প্রতিযোগীরা বিভিন্ন সময়ে জেলা এবং ডিভিশনাল পর্যায়ে যা সোনামুখী কলেজকে জেলা ও রাজ্যস্তরে এক উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। এখানেই শেষ নয়, যুব সংসদ প্রতিযোগিতার সাথে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতাতেও সোনামুখী কলেজ ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৪-২০১৫ সালে প্রথম স্থান এবং ২০১৩-২০১৪ সালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জেলাস্তরে। এছাড়া বিগত বছরে চালু হওয়া সংসদ সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক বক্তৃতাতেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যা সোনামুখী কলেজকে উন্নত থেকে উন্নততর স্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

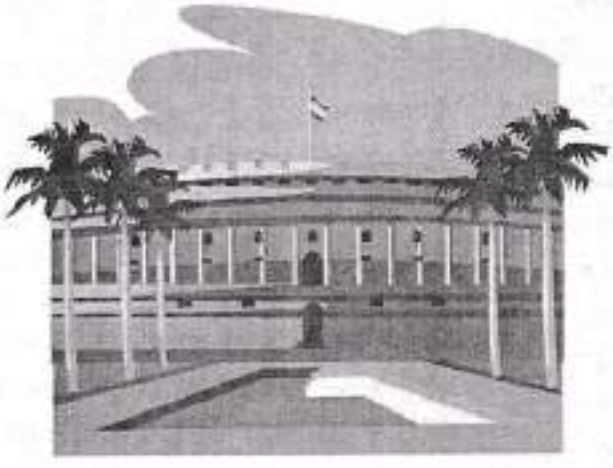

"যে যেরূপ ভাবনা করে থাকে, তার সিদ্ধিও সেইরকম হয়ে থাকে।"

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

গল্প

ডাইনি

— পূর্ণেন্দু পাল
(বায়ো-পাশ, ২য় বর্ষ)

ছোটোবেলা থেকেই রাহুল ছিল বুদ্ধিমান, দয়ালু ও উদার মনের। একবার এক ছেলেকে রাস্তার থেকে তুলে আনে, ওর নাম হারু। হারু ওর বাড়িতে কাজ করে।

রাহুলের বাবা নেই, বাড়িতে আছে ওর মা, একটি বোন সুমি। এখন রাহুল ২৮ বছরের। পড়াশোনা শেষ করে চাকরির চেষ্টা করে চলেছে। যেহেতু ও ছাড়া আর রোজগারের কেউ নেই তাই যেমন করে হোক ওকে যে কোনো একটা চাকরি পেতে হবে।

একদিন একটা ইন্টারভিউ-এর ডাক পেল। শহরে গেল ইন্টারভিউ দিতে। হাতে অনেক সময় ছিল। তাই কোম্পানির বাগানের দিকটায় বসে রইল। হঠাৎ দেখল একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে কান্নাকাটি করছে। কাছে গিয়ে রাহুল তার নাম ও কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি উত্তর দিল, যে ওর নাম আঁখি। ওর বাবা-মা কেউ নেই – বাড়িভাড়া মেটাতে না পারায় বাড়িওয়ালা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দয়ালু রাহুল তাকে সঙ্গে করে আনে, ইন্টারভিউ-এ পাশ করে যায় এবং ভালো বেতনের একটা কাজ পেয়ে যায়। বাড়ি এসে ওর মাকে সব বলে। বাড়ির লোক সব মেনে নিলেও সমাজের লোক মানতে চাইল না; একটা অচেনা যুবতী মেয়েকে বাড়িতে রাখাটা। তাই রাহুলের সঙ্গে আঁখির বিয়ে দিয়ে দিল।

বিয়ের পর আঁখি সব কাজ করে দিত, এতে সবাই খুশি হল। কিছুদিন পর দেখল গোরু, ছাগল সব কেমন যেন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।

হারু প্রতিদিন গুণে গুণে সব ঘরে ঢোকাত কিন্তু সকাল হলে একটা করে কমে যেত। একদিন যখন সব গরু, ছাগল শেষ হয়ে গেল তখন হারু ঠিক করল এ বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে।

এতদিনের বিশ্বাসের ছলের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া কেউ চাইল না। কিন্তু হারু ঠিক করল এ বাড়িতে আর থাকতে পারবে না। হারু বলল সকালে চলে যাবে।

সকালে দেখল হারুর ঘরের জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো। তারপর, কোনো জিনিস হারু নেয়নি, কিন্তু হারু নেই। সবার সন্দেহ হল এবং হারুকে খুঁজতে লাগল। অনেক খোঁজার পর মাঠে দেখল হারুর মাথাটি। তার জামা-কাপড় রক্তে ভেজানো পড়ে আছে।

সেদিন সুমি দেখল ওর বৌদির নখে রক্তের মতো দাগ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাকে বলে। ওর মা রাহুলকে বলে সব। কিন্তু রাহুল এটা মেনে নিতে পারেনি এবং ওর মাকে ভুল বোঝে।

সেদিন রাত্রে সুমি এবং ওর মা ঠিক করে যে, বাপের বাড়ি যাবার নাম করে এক তান্ত্রিক নিয়ে আসবে ওর মা। তাই সুমিকে সাবধানে থাকতে বলে। পরদিন দেখল পাশের বাড়ির এক বাচ্চা ছেলেকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সেদিন বিকালে ওদের মা বাপের বাড়ি যাবার নাম করে তান্ত্রিককে আনতে যায়। সেদিন রাত হয়ে যাওয়ায় আর আসতে পারে না।

সুমি রাত্রে একা শুয়ে আছে, ভয়ে ওর ঘুম হল না। হঠাৎ মাঝরাতে শুনতে পেল ওর বৌদি ডাকছে। কিন্তু সুমি দরজা খুলল না। রাগে আঁখি রাহুলের ওপর চড়ে বসে। ঘুমের মধ্যে রাহুল বুঝল যে ওর মধ্যে কেউ

ভারি পাথরের মতো কিছু চাপিয়েছে, আর ওকে নড়তে দিচ্ছে না। রাহুল চোখ খুলতেই দেখল আঁখি কেমন রোগে আছে আর ওর চোখ একদম লাল হয়ে গেছে। কিন্তু দেখল আঁখি ওকে কিছু করল না। সে রাত্রে রাহুলও আর ঘুমোতে পারল না। খুব ভোরে রাহুল সুমির কাছে চলে গেল এবং অপেক্ষা করতে লাগল 'মা'-এর।

কিছুক্ষণ পর দেখল আঁখি খুব জোরে চিৎকার করছে আর ছটফট করছে। বাড়ি থেকে পালাতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তারপর দেখল এক তান্ত্রিক আর ওদের মা আসেছে। তান্ত্রিক ঘরে ঢুকতেই আঁখি নিজ মূর্তি ধারণ করল। কিন্তু তান্ত্রিক-এর শক্তির কাছে আঁখির শক্তি কিছুই না। তান্ত্রিক হাতে একটু ঘটের জল নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে আঁখির মধ্যে ছিটিয়ে দিল; সঙ্গে সঙ্গে আঁখি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জ্বলতে লাগল এবং শেষ হয়ে গেল।

"অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রবন্ধ

Students and the Present Education System in our State

– Dr. D. Banerjee
Associate Professor (Dept. of English)

It is a truth, perhaps universally acknowledged that education cannot and should not be divorced from society in general or to be precise, socio-economic-political milieu. Inevitably the objectives of education should be defined and detailed in terms of socio-political needs. Hence education is the outcome of a mutually enriching interaction between ideals and reality governed situation. All educational thinkers from A.N. Whitehead to Dr. S. Radhakrishnan accept the truth that education for the present age should be matched with the socio-political demands of the poeple.

What is the purpose of education? All education is definitely a search for truth. It is also a pursuit of social betterment. So far as the first purpose is concerned, we are all aware that a diligent student goes through his text books; attends lectures in theoritical classes of his teachers and carefully looks through the glass of a microscope in a practical science laboratory only to know more and more in searech for ultimate truth. The world famous scientist Ronald Ross could successfully invent the malaria parasite and its life-cycle through his research with so much devotion night after night that the screws of his microscope got rusted. That is search for truth-truth that led the mankind in general to win over the dreadful disease, named Malaria.

The second purpose of education is social betterment. To fulfil this purpose, many thinkers sought to emphasize on the betterment of the character of persons in the society and it is feasible in democratic form of Govt. India is undoubtedly one such democratic state in the world where this second purpose of education can easily be translated into reality. Ironically there is a paradoxical situation for the writers and thinkers in the State. The betterment of human characters is a corol-

lary to the betterment of society, or the socio-political milieu of a country. The writers or educational thinkers have always go on trying their level best to enlighten the poeple dispelling the darkness of ignorance; to make them aware of the truth; to improve their level of thinking above their limited sphere; to raise their heads above the surge of religious fanaticism or political whirlpool and to reach the world of infinite crossing the bar of this finite world — this physical, down-to-earth world of hard reality. The readers get a we-struck when they read the pages of ***Wonder that was India*** by A.L. Basham or ***Counter-Attack and other poems*** by S. Sassoon or, ***The Waste Land and Other Poems*** by T.S. Eliot or, ***Waiting for the Mahatma*** by R.K. Narayan. All these works rouse the conscience of the people in general, leading to the betterment of their characters – characters who become socially and politically conscious. The irony lies in the hurdles of publishing some remarkable books, papers or pamphlets. Very often the faces of writers are blackened; their lives are threatened and characters maligned. The Govt is forced to ban those books or papers to pamper the demands of a section of people who prefer their orthodox dogmas to transparent truths, expressed in the books that might have made them better citizens, better politically conscious people.

What should the students do in the present context? Should they follow the orthodx people or free their minds from all restraints — whether religious or political or social or sectorial? Students in general have enough possibilities, enough potentialities to change the society, to change the socio-political set-up of the country, to lead the people to a better tomorrow. They only can think like our ex-president A.P.J. Abdul Kalam : "I have my wings, I will fly and I will definitely fly."

"চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।" — স্বামীজী

গল্প

হঠাৎ আর্তনাদ

— নুরতাজ্ খাতুন
(সাম্মানিক দর্শন, ৩য় বর্ষ)

আমরা কয়েকজন বন্ধু ঠিক করলাম যে বেশ কয়েকবার পিকনিক করেছিলাম সবাই মিলে ঠিকই, কিন্তু এবছরের অর্থাৎ ২০১৫ সালের পিকনিকটা হবে এক জাঁকজমকপূর্ণ এবং তার সঙ্গে অফুরন্ত হই-হুল্লোড় হবে। পয়লা জানুয়ারী আমরা বেরিয়ে পড়লাম পিকনিক করার উদ্দেশ্যে। আমাদের পিকনিক করার জায়গাটি ছিল খুবই সুন্দর মনোরম পরিবেশাচ্ছন্ন। আমরা যেখানে পিকনিক করতে যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি তার নাম ছিল রাজগ্রাম। অবশেষে সেখানে পৌঁছালাম বেলা ১২টায়। সেখানে গিয়ে সবাই নিজের নিজের জিনিসপত্র বের করতে লাগল কিন্তু আমি ?

আসলে আমি ছিলাম একটু প্রকৃতিপ্রেমিক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে আমি খুব ভালোবাসি। প্রকৃতি আর আমার মনের মধ্যে সবকিছুকে দেখার প্রবণতার মধ্যে বিরাজ করত প্রবল কৌতূহল। রাজগ্রামের মধ্যে আমাদের পিকনিক করার জায়গাটি ছিল যেখানে, সেখানে ছিল একটা সুন্দর সবুজ মাঠ। প্রকৃতির সুন্দর সবুজ প্রান্তর দেখে আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। যতই এগিয়ে যাই, ততই দেখতে পাই অজানা এক পরিবেশ। তা দেখে আমি আরও এগিয়ে যাই। সবুজের সুকোমল মন যেন আমাকে আরও হাতছানি দিয়ে ডাকে। হঠাৎ যেন আমি এক আর্তনাদ শুনতে পাই। কিন্তু সেই আর্তনাদটি ছিল অস্পষ্ট। যেই আমি সেদিকে পা ফেলি যাবার জন্য, ঠিক তখনি আমাকে ডেকে নেয় আমার বন্ধুরা। আর তারা আমাকে বকতে শুরু করে এবং বলে যে এখানে তুই কৌতূহলী হওয়াটা বন্ধ কর, আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাটা বন্ধ কর। তারপর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তারা পিকনিক করার স্থানে। কিন্তু আমার পা সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও আমার মন যেন বারবার ভাবে আর্তনাদের ব্যাপারটিকে নিয়ে। যাইহোক সেখানে গিয়ে আমরা সবাই এক-একজনের প্রতি এক-একটি কাজ ভাগ করে নিলাম। রাঁধুনিরা রান্না করতে লাগল। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কাটছে সবজি, কেউ উনুন ধরাচ্ছে, আবার কেউ পিকনিকের স্থানটি পরিষ্কার করছে। আর আমি এবং অনিক ও সুনয়না নিয়েছি জল আনার ভার। আমরা তিনজন তিনটি জায়গা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জল আনতে। জল পাওয়া যায় ঐ সবুজ প্রান্তর পেরিয়ে। সেখানে পাওয়া যেত ঝরণার জল। ঐ জলে যেন স্পষ্টভাবে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা যেত। যেদিকে শুনতে পেয়েছিলাম আর্তনাদ – ঝরণার জল পাওয়া যেত তারই কাছাকাছি। জল নিয়ে যেই ফিরব ঠিক সেই সময় শুনতে পেলাম আবার সেই আর্তনাদ। আমরা তিনজন বন্ধু একে অপরের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণ অনিক ও সুনয়না ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল এবং হঠাৎই তাদের দুজনের হাত থেকে জল পড়ে গেল। কিন্তু আমি যখনই আর্তনাদ শুনতে পেলাম তখনই আমার মনের মধ্যে কৌতূহল আরো বেড়ে গেল এবং আমি ওদেরকে বললাম – চল দেখি, ঠিক কোথা থেকে ঐ আর্তনাদ আসছে। আমরা সেদিকে এগোতে লাগলাম। অনিক ও সুনয়না ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগল, এদিকে আমি অনেক দ্রুত গতিতে সেখানে পৌঁছালাম। অবশেষে দেখতে পেলাম একটা খুব পুরনো রাজবাড়ি। তার চারপাশটা যেন কোথাও কিছু নেই। রাজবাড়িটির কোনো কোনো জায়গা ভেঙে পড়ে আছে। রাজবাড়িটির পরিবেশটা যেন নির্জন। রাজবাড়িটির মধ্যে আমি সাহস করে প্রবেশ করলাম এবং প্রবেশ করতেই শুনতে পেলাম চারিদিক থেকে যেন ভেসে আসছে কান্নার আওয়াজ। এদিকে অনিক ও সুনয়না কান্নার আওয়াজ শুনে ভয়ে রাজবাড়িতে ঢুকতেই

চায় না। কিন্তু আমি জোর করে ওদেরকে নিয়ে গেলাম সেখানে। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম এই আর্তনাদের ব্যাপারটা কী। পরে দেখতে পেলাম চারজন লোক এল, এসে তারা রাজবাড়ির মধ্যে থাকা একটি ঘর খুলল, আবার তার ভেতরে একটা ঘর খুলল; ঠিক তখনই আমি প্রথম ঘরটির মধ্যে ঢুকে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়েরইলাম এবং শুনতে থাকলাম ওরা কী বলে। আর দু'জন বন্ধুকে ঘরের বাইরে লুকিয়ে থাকতে বললাম। আমি তখন শুনতে পেলাম ঐ চারজন লোক বলছে – ২০১৪ সালে তোরা পিকনিক করতে এসেছিলি এই রাজগ্রামে। তোদের অবস্থা কী হয়েছে তোরা তা বুঝতে পারছিস। ঠিক ২০১৫ সালে পিকনিক করতে আসা ছেলে-মেয়েগুলোকে ধরে আনব এখানে আর তোদের মতো চাকর করে রাখব সারাজীবন। সবাই ভাববে রাজবাড়ির ভূতেরা মেরে দিয়েছে তোদেরকে – এই বলে হা-হা-হা করে হাসতে লাগল। তখন আমি উঁকি মেরে দেখলাম আমাদের মতোই ঐ ছেলে-মেয়েগুলির বয়স। তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। তাদের অবস্থা খুবই বিপদজনক। অবশেষে ঐ লোকগুলো বেরিয়ে পড়ল এবং ঘরটির দরজা লাগাতে ভুলে গেল। ফলে তাদের বের করতে আমাদের সুবিধা হল। লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা পিকনিক করার স্থানে ফিরে এলাম এবং অন্য বন্ধুদের সব ঘটনাটি বললাম। এটাও বললাম এখানে থাকলে তাদের বিপদ বাড়তে পারে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল। ফলে আমরা সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম এবং রাজবাড়ি থেকে উদ্ধার করা ছেলে-মেয়েগুলিকে ফিরিয়ে দিলাম তাদের বাবা-মায়ের কাছে। আমার বন্ধুরাও তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। যখন সবাই রাজবাড়ি সম্বন্ধে বলল যে তারা জানত সেটিতে ভূত থাকে তখন আমরা তাদের রাজবাড়ি সম্বন্ধে ভুল ধারণাটি ভেঙে দিলাম।

আমার বন্ধুদেরকে বললাম যে কোনো কিছু সম্পর্কে কৌতূহল হলে তাকে এড়িয়ে না গিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কৌতূহলটির সমাধান করতে হবে। অবশেষে আমি এটা ভাবলাম যে আমরা এবং রাজবাড়ি থেকে উদ্ধার করা ছেলে-মেয়েগুলি বেঁচে গেলাম ঐ চারজন লোকের হাত থেকে। কিন্তু ঐ ঠগ্‌বাজ, নিষ্ঠুর লোকগুলি তো একইভাবে অত্যাচার শুরু করবে ২০১৬ সালে। যারা রাজগ্রামে পিকনিক করতে যাবে তাদের জন্য আমরা বন্ধুরা পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা শোনালাম এবং পুলিশ গিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করল। সমস্যাটির সমাধান হওয়ার জন্য আমি পেলাম এক অফুরন্ত আনন্দ এবং আমার বন্ধুরাও বুঝল কোনো কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য কৌতূহলী হওয়াটাও প্রয়োজন।

"দম্ভ করে কিছুই বলো না, তোমার কাজই বলুক তোমার হয়ে কথা।"

— শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

নিবন্ধ

স্বার্থের জালে আবদ্ধ মানুষ

— প্রিয়া মণ্ডল
(সাম্মানিক ইংরাজী, ২য় বর্ষ)

পালাবদল ঘটল যেমন রাজনীতিতে, তেমনি পালাবদল ঘটে চলেছে মানুষের পরিচয়ে। মান আর হুঁশ যার মধ্যে আছে সেই হচ্ছে মানুষ। কিন্তু এই দুটোই আজ নষ্ট হতে বসেছে। মানুষ সৃষ্টি করেছিল এই সমাজ। সেই সমাজে ঢুকে পড়েছে স্বার্থ। এই স্বার্থ এত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে যে, মানুষ বলে পরিচয় দিতে আজ লজ্জা বোধ হয়। স্বার্থ ভয়ঙ্কর ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে। স্বার্থ আমাদের কাজে, স্বার্থ আমাদের মনে। কত আর বলব, সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে স্বার্থ। এখন প্রশ্ন হল স্বার্থ ছাড়া কি মানুষ নেই? আছে, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। কিছু মানুষের স্বার্থ না থাকলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বা সঠিক কথা বলতে মানুষ আজ ভুলে গেছে। সে কোনো ব্যাধিতে ভুলে যায়নি, সে ভুলে গেছে নিজের স্বার্থের কাছে। আমার মতে স্বার্থের কিছু নমুনা লিখছি; দেখুন মেলে কিনা।

গ্রামে বাস করে মধু বলে এক ছেলে। সমাজে বসবাসকারী আরও পাঁচটা ছেলের মতই বাস করে। হঠাৎ সে যখন রাজনীতিতে প্রতিপত্তি লাভ করে, তখন স্বার্থান্বেষী মানুষের কাছে রাতারাতি মধু হয়ে যায় মধুসূদন।

এবার পড়ুন সমাজে বসবাসকারী পুরুষ কিংবা স্ত্রী অবসর সময়ে একত্রে বসে অন্যদের বাড়ীর বউ কিংবা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সমালোচনা করে। তখন কত বড় বড়ই না কথা বলে নিজেদের সম্বন্ধে। পরক্ষণেই সেই সমালোচনা যখন নিজেদের মধ্যে প্রযোজ্য হয়, তখন তারা সমালোচনাটা সহজ করার কিংবা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এছাড়া চাকরি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বাড়ীর মেয়েদের রান্নাঘর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এই স্বার্থ। এই স্বার্থের কারণে যৌথ পরিবার আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে বসেছে। প্রতি বছর বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। হানাহানি, মারামারি তো লেগেই আছে। এই স্বার্থ যদি একজন মায়ের মনে প্রবেশ করে তাহলে সমাজ, সংসার সব রসাতলে যাবে।

এখন প্রশ্ন হল আমাদের কি কিছুই করার নেই?

এর থেকে মুক্তি পাবার একটাই উপায় হল – স্বার্থ দেখলেই প্রতিবাদ। কথায় আছে – "অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি এবং লড়ব এর জন্য সমাজ আমাকে যে নামেই আখ্যা দিক্। আমি জানি – দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ / সীতার পাতাল প্রবেশ / রাধাকে কলঙ্কিনী বলে – ভর্ৎসনা করেছে এই সমাজ। আমি তো এক সামান্য নারী মাত্র।

যে স্বার্থের কারণে সমাজ, সংসার, দেশ আজ রসাতলে যেতে বসেছে, সেই স্বার্থ আমাদের সমাজ থেকে বর্জন করব এই মর্মে দীক্ষিত হই।

আমরা যদিও গান্ধীজি, নেতাজী, মাদার টেরেসা, সিস্টার নিবেদিতা হতে না পারি, একজন আদর্শ নাগরিক হিসাবে স্বার্থবিহীন সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে।

"যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।।"

এই কথা স্মরণ রেখে আসুন আমরা প্রত্যেকে স্বার্থ ভুলে নতুন শুভবোধে জাগ্রত হই।

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

গল্প

আমি দোষী

— অর্থনু দুয়ারি
(কলাবিভাগ, ৩য় বর্ষ)

দিনটা ছিল সোমবার। সকাল ৫টা। হঠাৎ-ই চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু কিজন্য এত চেঁচামেচি, এটা বুঝতে পারলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে বুঝতে পারলাম আমার সব সময়ের বন্ধু মানস মারা গেছে, বিষ খেয়ে। আমি কথাটা শুনে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে শুনতে পেলাম সেল একটা চিঠি লিখেছে। আর তাতে লেখা আছে "আমার আর কারোর দরকার নেই।" পড়েতো কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঠিক তিনমাস পর আমি আর আমার বোন এই ব্যাপারে একদিন আলোচনা করছিলাম। হঠাৎই সে কাঁদতে কাঁদতে বললো দাদা ..... তোকে একটা কথা বলব, কাউকে বলবি না। আমি বললাম না, বল কি হয়েছে?? সে বলল মানসের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। আমি বললাম তুই কী বলতে চাইছিস? সে বলল আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম। তারপর সে তাদের পুরনো প্রেমের দিনগুলোর কথা বলল। মানস-এর দেওয়া গিফ্‌টগুলো দেখলাম। তা এতে তোর দোষ কী? সে বলল তোকে ভয় হচ্ছে। আমি বললাম তোর ভয় নেই। সোমবারের আগের রাত্রে আমাদের দুজনের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। আমি ওকে বলি যে তুমি বল না, তুমিতো জানো "আমি দাদাকে যত ভালোবাসি তত ভয়ও করি।" সে বলল, তোমার দাদাকে বলতে পারবো না, কারণ আমার বন্ধুকে কোনোদিন হারাতো পারবো না। তখন আমি ওকে বললাম তাহলে আমাকে ভুলে যাও। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সে বলেছিল যদি তুমি আমাকে কোনো ভুলে যেতে বলো তাহলে সে শুধু আমাকে নয়, সে এই পৃথিবীকে ভুলে যাবে। সব শুনে আমি মনে মনে বললাম ...... আমার বন্ধুর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমি তাহলে আসল দোষী।

"আজ দেশে সর্বাপেক্ষা বড় অভাব মানুষের। দেশ-গঠন, জাতি-গঠন, সমাজ-গঠন - যাহা কিছু বল না কেন, সর্বাগ্রে চাই মানুষ গঠন।" — **প্রণবানন্দ মহারাজ।**

প্রবন্ধ

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস

— অধ্যাপক শেখ মইনুল হক
বাংলা বিভাগ, সোনামুখী কলেজ

বৈষ্ণব মতকে কেন্দ্র করে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব বিপ্লবকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব কোন পুস্তক লিখে যাননি অথচ তাঁকে ঘিরেই জন্ম হয় এই সাহিত্যের। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সূচনা ঘটে চতুর্দশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-এর সময়ে, তবে ষোড়শ শতকে এই সাহিত্যের বিকাশ হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

বারো শতকে সংস্কৃতে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ এ ধারার প্রথম কাব্য। পরে চতুর্দশ শতকে বড়ু চণ্ডীদাস বাংলা ভাষায় রচনা করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একখানি আখ্যানকাব্য। বাংলা ভাষায় রচিত এটিই প্রথম কাব্য। এতে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বিভিন্ন ভাবের ৪১৮টি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ রয়েছে। পদগুলি গীতোপোযোগী করে রচিত। পদশীর্ষে সংশ্লিষ্ট রাগ-তালের উল্লেখ আছে। নাট্যগীতিরূপে পরিচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও অতুলনীয়। এ শতকেরই দ্বিতীয় ভাগে চণ্ডীদাস নামে একজন পদকর্তা আবির্ভূত হন। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে উৎকৃষ্ট মানের অনেক পদ রচনা করেন। পনেরো শতকে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৭৪-১৪৬০) ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক অনেক পদ রচনা করেন। পদগুলিবাঙালিদের নিকট এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, সেগুলির কারণে ব্রজবুলি ভাষাটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে অনেক বাঙালি কবি এই ভাষায় বৈষ্ণবপদ রচনা করেন।

এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। বর্ধমানের কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় (১৪৭৪) নামে সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন। এতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা অপেক্ষা ঐশ্বর্যলীলা অধিক প্রকটিত হয়েছে। একই সময়ে মুসলমান কবি আফজাল রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রূপকে কিছুপদ রচনা করেন। পরে বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব ঘটে। তিনি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন এবং কৃষ্ণস্মরণ আবেগাপ্লুত হতেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে যাঁরা কৃষ্ণ চরিত্র প্রকাশ করেছেন, তাঁরা কেউ বৈষ্ণব ছিলেন না। উপরন্তু তাঁদের রচিত পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক দিক প্রকাশ পায়নি; তাঁরা রাধাকৃষ্ণেররূপকে লৌকিক প্রেমের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এজন্য কেউ কেউ প্রাকচৈতন্য পর্বের এসব রচনাকে বৈষ্ণব সাহিত্য বলার পক্ষপাতী নন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি বৈষ্ণব সাহিত্য হলেই আখ্যাত ও আলোচিত হয়ে আসছে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্রীচৈতন্য তরুণ বয়সে কেশব ভারতীর নিকট বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হন এবং কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রবর্তক। মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ চৈতন্যদেব পার্ষদ-পরিকর, ষড়গোস্বামী এবং অসংখ্য ভক্ত সহযোগে দেশব্যাপী একটি ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার দিগন্ত বিস্তৃত হয় এবং এক সময় এর সঙ্গে চৈতন্যদেবের লৌকিক-অলৌকিক জীবনলীলাও যুক্ত হয়। চৈতন্যলীলা বিষয়ক গৌরপদ ও বিশাল আকৃতির চরিতকাব্য এ পর্বেই রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ সময় অনেক মহান্তজীবনীও রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব-দর্শন ও চৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে (চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ইত্যাদি)। বাংলা

ভাষাতেও রসসমৃদ্ধ পদাবলি, তথ্যসমৃদ্ধ চরিতকাব্য, তত্ত্বসমৃদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদি রচিত হয়েছে।

পদাবলি ষোলো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত তিনশ বছর ধরে বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছে। গীতোপযোগী ও ভণিতাযুক্ত ছন্দোবদ্ধ রচনা 'পদ' নামে অভিহিত। প্রেমের একটি ভাবকে অবলম্বন করে পদগুলি রচিত। প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগ-তালের উল্লেখ আছে। চৈতন্যোত্তর কালে বৈষ্ণবপদের ভাব ও রসের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাৎসল্য ও সখ্য রসের নতুন পদাবলি। বন্দনা, প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সাধনাযুক্ত পদগুলিও নতুন মাত্রা যোগ করে। এ যুগের কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক পদে ঐশী মহিমা ও আধ্যাত্মিকতার রূপক আরোপকরেন। তাঁদের কাছে বৈষ্ণব কবিতা ছিল বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। এ পর্বে কতজন কবি কী পরিমাণ পদ রচনা করেছেন, তা সঠিকভাবে বলা দুষ্কর। দু-চারজন ছাড়া অন্যান্য কবির রচনার পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তাঁরা তো লিপিবদ্ধ করেননি; কীর্তন গায়কদের মুখে মুখে পদগুলি প্রচারিত হতো এবং ভণিতা থেকে কবির নাম ও তাঁর রচনা শনাক্ত করা হতো।

আঠারো শতকের গোড়া থেকে কিছু পদ-সংকলন পাওয়া যায়, যেমন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয় ইত্যাদি। পদকল্পতরুতে প্রায় দেড়শত কবির তিন হাজার বৈষ্ণব পদ সংকলিত হয়েছে। এতে পদগুলি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, দৌত্য, অভিসার, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রেমবৈচিত্র, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি ক্রমে বিন্যস্ত। আবার নায়িকার অবস্থাভেদেও মানিনী, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা ইত্যাদি প্রকার বিভাজন আছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৫ গ্রন্থে ১৬৪ জন পদকর্তার নাম এবং ৪৫৪৮ টি পদসংখ্যার উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে নতুন পুরাতন কবির আরও অনেক পদ পাওয়া গেছে। বর্তমানে বৈষ্ণবপদের সংখ্যা সাত-আট হাজার। এগুলির মধ্যে মুসলমান কবির রচিত পদও রয়েছে। আফজাল, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা, আলি রেজা প্রমুখ মুসলমান কবি চৈতন্যলীলা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, ভজন, রাগানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ক পদ এমনভাবে রচনা করেছেন যে, বৈষ্ণব কবিকৃত পদাবলি থেকে সেগুলিকে পৃথক করা যায় না। মুসলমান কবিরা সম্ভবত সুফিতত্ত্বের আলোকে শ্রীচৈতন্যকে পীর-গুরু এবং রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীকরূপে দেখেছিলেন।

পদকর্তা হিসাবে ষোলো শতকে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস; সতেরো শতকে কবিরঞ্জন (ছোট বিদ্যাপতি), কবিশেখর, রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যাম দাস, রামগোপাল দাস; আঠারো শতকে বৈষ্ণব দাস চন্দ্রশেখর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী, যদুনন্দন প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের মধ্যে আবার জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জন, যদুনন্দন প্রমুখ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। নানা ভাবের পদ রচনা করেও যেমন বিদ্যাপতি বিরহের পদ ও চণ্ডীদাস প্রেম-মিলনের পদ রচনায় অধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তেমনি জ্ঞানদাস অনুরাগের এবং গোবিন্দদাস অভিসারের পদ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁদের শিল্পগুণসম্পন্ন পদগুলি ধর্মের মোড়কে ভেদ করে সার্বজনীন সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বর্ণনা করতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা মর্ত্যের নরনারীর আবেগ অনুভূতিকেও স্পর্শ করেছেন। তাঁদের ভাব এবং ভাষার কুশলতায় বৈষ্ণব কবিতার এক অর্থ অপ্রাকৃতলোকে আধ্যাত্মিকতার দিকে গেছে, অপর অর্থ মর্ত্যের মানব-মানবীর সুখ-দুঃখপূর্ণ চিরন্তন প্রেমের দিকে গেছে। সমালোচকদের মতে কিছু কিছু পদ ভাব, রস ও শিল্পগুণে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্কনে সহজেই স্থান করে নিতে পারে। নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলি এরূপ চিরায়ত কাব্যসৌন্দর্য ও মর্যাদার অধিকারী।

বিষয় ভিত্তিতে বৈষ্ণব পদগুলি চার ভাগে বিভক্ত : গৌরলীলা, ভজন, রাধাকৃষ্ণলীলা ও রাগাত্মিকা। প্রথম

শ্রেণির পদে গৌরলীলা অর্থাৎ চৈতন্যলীলা বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় শ্রেণির পদে গুরু-মহাজনের প্রতি বন্দনা-প্রার্থনা করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির পদে ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এ ধারার পদ রচনায় কবিরা সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন। আর এরূপ পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তত্ত্বভিত্তিক রাগাত্মিকা পদগুলিতে গুহ্য সাধনার কথা আছে। ফলে পদগুলি সরলতা হারিয়ে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সময়ের বিচারে ষোলো শতক বৈষ্ণবপদ রচনার শ্রেষ্ঠ সময়, সতেরো শতকে এর বিকাশ সাধিত হয়, আর আঠারো শতকে অবনতি ও সমাপ্তি ঘটে। বৈষ্ণব সাহিত্যের অপরাপর রচনা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। বস্তুত বৈষ্ণব আন্দোলনের উত্থান-পতনের সঙ্গে বৈষ্ণ সাহিত্যও সম্পৃক্ত ছিল।

চরিতকাব্য শ্রীচৈতন্য ও তাঁর কয়েকজন সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে বৈষ্ণব চরিতশাখা গড়ে ওঠে। কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই চরিতকাব্য একটি অভিনব ধারা। সমকালের অথবা ঈষৎ পূর্ববর্তী কালের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে বিশালাকার এরূপ কাব্য অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। সংস্কৃতে রচিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত। এর রচয়িতা মুরারি গুপ্ত ছিলেন চৈতন্যদেবের সতীর্থ। গ্রন্থখানি গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে 'কড়চা' বা ডায়রি আকারে রচিত। এজন্য এটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেও পরিচিত। এতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম থেক মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা আছে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনীকাব্য চৈতন্যভাগবত (১৫৪৮) তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছর পরে রচিত হয়। শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর নিত্যানন্দের উৎসাহে বৃন্দাবন দাস প্রায় ২৫ হাজার জোড় চরণে এ বিশাল কাব্য রচনা করেন। মুরারি গুপ্ত রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ হিসেবে চৈতন্যদেবের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন, আর বৃন্দাবন দাস শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপ চৈতন্যলীলা প্রচার করেন। সময়ের দিক থেকে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল (১৫৭৬) দ্বিতীয় এবং ষোলো শতকের শেষ দিকে একই নামে জয়ানন্দ রচনা করেন তৃতীয় গ্রন্থ। তুলনামূলকভাবে লোচনদাসেরর চৈতন্যমঙ্গল অধিক পরিশীলিত ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। তিনি নিজ বাসস্থান শ্রীখণ্ডের ভাবধারা অনুযায়ী 'গৌরনাগর' রূপে শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন। চৈতন্যদেবের চতুর্থ জীবনীকাব্য কৃ,ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত (১৬১২)। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের অন্যতম গোস্বামী রঘুনাথ দাসের শিষ্য ছিলেন। প্রামাণিক তথ্য, বিষয়বৈচিত্র্য, রচনার পরিপাট্য প্রভৃতি গুণে কাব্যখানি পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। চৈতন্যজীবন মুখ্য বিষয় হলেও এতে বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব, দর্শন, বিধিইভধান, সমকালের ইতিহাস, সমাজ এবং ঐতিহ্যের নানা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের যে ঐশী প্রেম ও ভক্তিবাদের ওপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যকে তারই বিগ্রহরূপে চিত্রিত করেছেন। পাঠকনন্দিত ও কাব্যখানির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সি ডিমকের ইংরেজি গদ্যানুবাদ টনি কে স্টুয়ার্টের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়ান অদ্বৈত আচার্যের জীবনী নিয়ে সংস্কৃতে একখানি এবং বাংলায় চারখানি কাব্য রচিত হয়েছে। বাল্যলীলাসূত্র (১৪৮৭) নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন হরকৃষ্ণ দাস। এতে অদ্বৈত আচার্যের বাল্যলীলার বিবরণ আছে। বাংলা ভাষায় অদ্বৈতপ্রকাশ (১৫৬৯) নামে প্রথম কাব্য রচনা করেন ঈশান নাগর। এরূপ দ্বিতীয় কাব্য হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল। একই নামে শ্যামদাস তৃতীয় কাব্য রচনা করেন, তবে তার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। নরহরি দাস অদ্বৈতবিলাস নামে চতুর্থ কাব্য রচনা করেন আঠারো শতকে। এসব কাব্যে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবেরও অনেক প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবীর জীবনী সীতাচরিত ও সীতাগুণকদম্ব যথাক্রমে লোকনাথ দাস ও বিষ্ণুদাস আচার্য

রচনা করেন। চৈতন্যদেবের অপর ঘনিষ্ঠ সহচর শ্রীনিবাসের জীবনচরিত প্রেমবিলাস (১৬০১) রচনা করেন নিত্যানন্দ দাস। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ (১৬০৮), গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত এবং মনোহর দাসের অনুরাগবল্লরী কাব্যেও শ্রীনিবাসের কথা আছে। নরোত্তম আচার্যের জীবনী নিয়ে নরোত্তমবিলাস রচনা করেন নরহরি চক্রবর্তী। তাঁর অপর কাব্য ভক্তিরত্নাকরে একাধারে শ্রীনিবাস, নরোত্তম আচার্য ও শ্যামানন্দের জীবনী স্থান পেয়েছে। সতেরো শতকে আরও কয়েকখানি চরিতকাব্য রচিত হয়। অকিঞ্চিৎকর হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ব্যতিক্রম ছাড়া চরিতকাব্যের সাহিত্যিক মূল্য কম, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং বাংলার সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে জানার জন্য এগুলি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও দেবদেবীর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভারাক্রান্ত মধ্যযুগের সাহিত্যাঙ্গনে মানুষ মানুষের কথা লিখেছে; এতে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে।

নাটক কবিকর্ণপুর সংস্কৃতে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে চৈতন্যলীলাশ্রিত নাটক রচনা করেন। প্রেমদাস চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী নামে বাংলায় এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন। দশ অঙ্কের এই নাটকে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস জীবনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চৈতন্যদেব এ পার্বে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ও ভক্তিভাবে বিভোর থাকতেন। চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে রামানন্দ রায় সংস্কৃতে রচনা করে জগন্নাথবল্লভনাটকম্, যার বঙ্গানুবাদ করেন লোচনদাস।

আখ্যানকাব্য প্রধানত ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কিছু আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছে. তবে লৌকিক ও পৌরাণিক উৎস থেকেও তথ্য গৃহীত হয়েছে। ষোলো শতকে মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, সতেরো শতকে কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয়, ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রভৃতি এ শ্রেণির কাব্য। কাব্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে ঐশ্বর্যলীলার বর্ণনা।

শাক্তকথা বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সমাজ, সঙ্গীতবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কিছু নিবন্ধ বা খণ্ড কবিতা রচিত হয়েছে। নিত্যান্দের প্রেমবিলাস, যদুনন্দনের কর্ণানন্দ, মনোহর দাসের অনুরাগবল্লরী, অকিঞ্চন দাসের বিবর্তবিলাস প্রভৃতি এ জাতীয় রচনা। সঙ্গত কারণের সাধন-ভজনসংক্রান্ত এসব রচনায় সাহিত্যগুণের তেমন প্রকাশ ঘটেনি।

মধ্যযুগে কৃষ্ণকথা, রাধাকৃষ্ণ প্রেম, চৈতন্যলীলা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি অবলম্বনে যে বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মূল প্রেরণা ছিল শ্রীচৈতন্যের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ধর্মবোধ। এসব বিচিত্র বিষয় রচনার অঙ্গীভূত হওয়ায় বাংলা ভাষার চর্চা ও প্রকাশ ক্ষমতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। কবিগণ পদাবলির মাধ্যমে মানব মনের অতি সূক্ষ্ম ভাব, ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র ঘটনাপঞ্জি, শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করায় বাংলা ভাষা নানা মাত্রিকতায় বিকাশ লাভ করে। ফলে বৈষ্ণব পদাবলি একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয় হয়েও সাহিত্যগুণে কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বশ্রেণীর পাঠক-গবেষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যপ্তির ওগভীরতার পাশাপাশি বাংলা ভাষার উৎকর্ষ ও উন্নতির কথাৎ সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

–ঃ সহায়ক গ্রন্থ ঃ–

১) *গোবিন্দদাস পদাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কোলকাতা ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬।*
২) *বাংলা সাহিত্য পরিচয়, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৮।*
৩) *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় – ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী।*
৪) *পদাবলী মাধুর্য (১৯৩৭) – দীনেশচন্দ্র সেন।*

গল্প

রেনেসাঁস

— শুভপা দে
(কলাবিভাগ, ১ম বর্ষ)

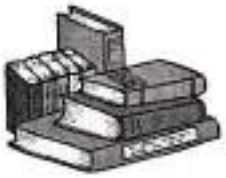

মিলনমেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম কয়েকজন বান্ধবী মিলে। কখনও এ স্টল থেকে ঐ স্টলে। যখন মোমোর স্টলের সামনে এলাম – একটা নোংরা প্যান্ট-জামা পরা উস্কোখুস্কো চুলওলা বছর ৫-৬ এর বাচ্চা ছেলে সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়ালো, "দিদি দুটো টাকা দাও না, পাঁপড় ভাজা খাবো।" ছেলেটার মুখ দেখে ভারী মায়া হলো। বললাম, "তোকে যদি একটা বই কিনে দিই, নিবি?"

ছেলেটা মাথা নাড়লো আর আঙুল তুলে পাশের স্টলে দড়িতে ঝুলে থাকা প্লাস্টিকের ছবিওয়ালা বইটা দেখিয়ে আনন্দে লাফাতে লাগলো। অ-আ-ক-খ এর বইটা কিনে দিলাম ছেলেটার হাতে এবং সঙ্গে একটা গোটা পাঁপড়ভাজা। ছেলেটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। বেশ আনন্দ হলো।

পরের দিন ঝালমুড়ি খেতে খেতে স্টলে স্টলে ঘুরতে ঘুরতে আবার ঐ জায়গাটায় পৌঁছোতেই আঁতকে উঠলাম। দেখি ১০-১২টা ছেলে ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে আগের থেকেই। হয়তো আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম। মানিব্যাগ খুলে দেখলাম ২০০ টাকা আছে। এগিয়ে যাবার সাহস পেলাম না। ঝালমুড়ি খাওয়া শেষ। দেখি ঝালমুড়ির ঠোঙাটা ইতিহাস বইয়ের পাতা ছিঁড়ে তৈরী আর সেটার মধ্যে হেডিংটা ছিল 'রেনেসাঁস'।

একটু এগোতেই ছেলেগুলো আমার দিকে দৌড়ে আসতে লাগলো। চোখ-মুখ দেখেই মনে হলো তাদের প্রত্যেকের চাহি বই আর পাঁপড়ভাজা।

"যে ব্যক্তি অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, সে সর্ব্বলোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়।" – **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।**

নিবন্ধ

আমাদের কলেজ : আমার অনুভূতি

— আজমিরা খাতুন
(বি.এ. - পাসকোর্স, ২য় বর্ষ)

রোজ সকালে উঠে তিরিশ মিনিট সাইকেল করে এসে বাসে উঠি। বাস থেকে নেমে পৌঁছাই আমার সোনার শহর সোনামুখীতে। সেখানেই আমাদের কলেজ। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝাটে যতই কষ্ট হোক না কেন, তবু মনে হয় আমি যেন আমার মায়ের টানে যাচ্ছি। এই কলেজ আমাদের মায়ের সমান। প্রথম শিক্ষা আমরা শুরু করি মায়ের কাছ থেকে। তারপর আমার আস্তে আস্তে কলেজের দিকে পা বাড়ানো। আর এখানেই আমরা উচ্চশিক্ষা পেয়ে থাকি। এই কলেজের স্যারদের সুব্যবহার আর সিনিয়র দাদা-দিদিদের ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। স্যারদের ক্লাস আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে কখন পেরিয়ে যায় বুঝতে পারি না। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রী একত্রভাবে মিলিত হই এই কলেজে। পড়াশোনার ব্যাপারে যদি আমরা কোনো অসুবিধায় পড়ি তাহলে স্যারেরা তার সমাধান করার প্রাণপন চেষ্টা করেন। কলেজের দাদা-দিদিদের কাছ থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেয়ে থাকি। কলেজের শান্ত ও মনোরম পরিবেশ আমাদের মধ্যে বাঁচার উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। কলেজের মধ্যেই সমস্ত কিছুর বন্দোবস্ত করা আছে। যেমন – নতুন নতুন Subject চালু হয়েছে, নতুন লাইব্রেরি তৈরি হয়েছে, ক্যান্টিন তৈরি, ছেলে ও মেয়েদের কমনরুম, টয়লেট, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, N.C.C. Camp চালু, ছাত্রসংসদের এই সাফল্য থাকার জন্য কোনো ছাত্রছাত্রীকে কোনো অসুবিধায় পড়তে হয় না। এসব কিছু মিলিয়ে সোনামুখী কলেজে ভর্তি হওয়াতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

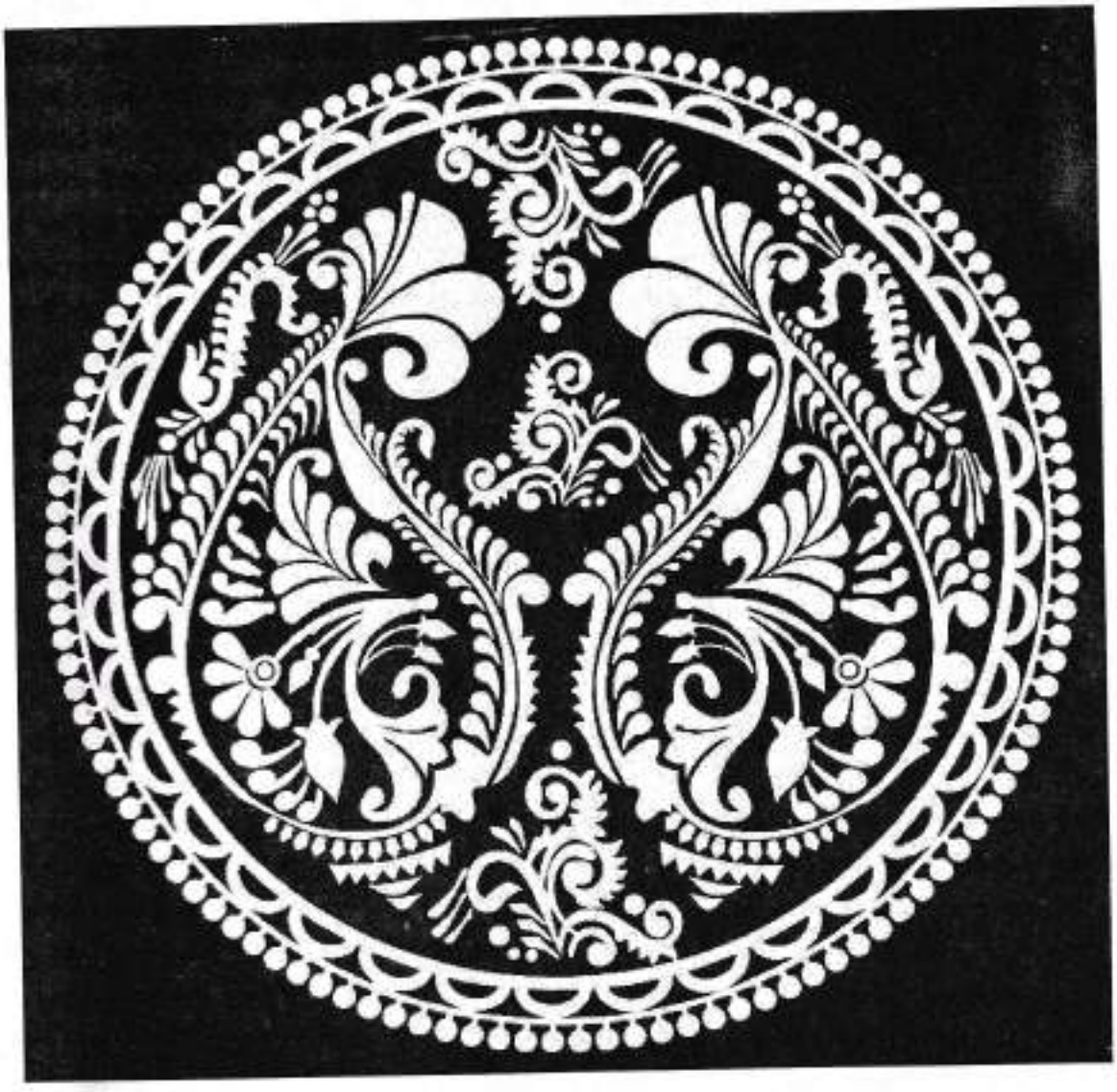

আমার সোনার
, তবু মনে হয়
বু করি মায়ের
চ্চশিক্ষা পেয়ে
করে তোলে।
াসা ছাত্র-ছাত্রী
াহলে স্যারেরা
া পেয়ে থাকি।
র মধ্যেই সমস্ত
য়েছে, ক্যান্টিন
াত্রসংসদের এই
নামুখী কলেজে

গল্প

অদৃশ্য

— সুস্মিতা কর্মকার
(বায়ো-পাস, ২য় বর্ষ)

অনেক বছর আগের কথা। শ্রেয়ান ছিল খুবই দরিদ্র পরিবারের ছেলে। তার বাবা ছোটবেলায় মারা গেছেন। বাড়িতে শ্রেয়ান আর তার মা। তাদের নুন আনতেপান্তা ফুরায়। এই সময়ে শ্রেয়ান পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর গ্রামে একটি স্কুলে স্কুলমাস্টারের চাকরির প্রস্তাব পেল। তাই সে দেরি না করে স্কুলের চাকরিটা করবে বলে ঠিক করে। কিন্তু তার মা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। সে মায়ের কথা না শুনেই চাকরিতে যোগ দেয়। কিন্তু বাড়ি থেকে চাকরি স্থানে প্রতিদিন যাতায়াত করা সম্ভব না অতদূর থেকে। তাই সে কাছাকাছির মধ্যে বাড়ির খোঁজ শুরু করে। বাড়ি পেলেও সে বাড়ির ভাড়া এত বেশি যে সে বাড়িভাড়া নিতে পারল না। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর স্কুল থেকে ১.৫ কিমি দূরে একটি পুরানো বাড়ি বেশ কম ভাড়াতেই পেয়ে গেল। তাই সে দেরি না করে ঐ বাড়িতে থাকতে শুরু করলো। স্কুল আসে যায়। নিজে রান্না করে। বেশ ভালোই থাকে সে।

একদিন সকালে হঠাৎ কড়া নাড়ার আওয়াজ। দরজা খুলে দেখেন ঐ পাড়ার ভূষণবাবু। সে তাকে দেখে হঠাৎ অদ্ভুত প্রশ্ন করে। বলেন, "আপনি ঠিক আছেন তো? আপনার কিছু হয়নি তো?" শ্রেয়ান উত্তরে বলল 'হ্যাঁ'। ভূষণবাবু আর কিছু না বলেই সেদিন চলে যান। কিন্তু ভূষণবাবুর কথায় শ্রেয়ানের খটকা লাগে। তারপর সে স্কুল থেকে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে গল্প লিখতে বসে। গল্প লেখা শ্রেয়ানের শখ। কিছুক্ষণ গল্প লেখার পর হঠাৎ মোমবাতি নিভে যায় এবং কেউ যেন পেছন থেকে তার গলা টিপে ধরে। তাকে মেরে ফেলার উপক্রম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে হাত দুটো আলগা হতে শুরু করে। সে মোমবাতি জ্বেলে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। তাই সে শুতে চলে যায়। পরের দিন একইভাবে সারাদিন কাটার পর রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে লিখতে বসে। কিন্তু মোমবাতি নিভে যায়। শ্রেয়ান মোমবাতি জ্বালাতে গেলে একটা মিষ্টি মহিলা কন্ঠে কেউ যেন বলল – "মোমবাতি জ্বালাবেন না। আমার অসুবিধা হয় আলোতে।" তাই শ্রেয়ান আর মোমবাতি জ্বালালো না। মেয়েটি আবার বলতে শুরু করল – "কাল ভেবেছিলাম আপনাকে শেষ করে দেবো যেমন করে আমার স্বামীকে শেষ করেছি তেমন করেই। কিন্তু ....." শ্রেয়ান মেয়েটিকে দেখার জন্য মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দেয়। মেয়েটি চলে যায় আর সে রাতে আসে না। পরের দিন রাতে আবারও গল্প লিখতে বসে। কিছুক্ষণ পরে মোমবাতিটা নিভে যায়। সে বুঝতে পারে ঐ মহিলার আগমন ঘটেছে। তাই সে প্রশ্ন করল, "কি হল, কাল রাতে চলে গেলেন যে?" মেয়েটি উত্তরে বলল, "মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিলেন তো তাই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।" তাহলে "আজ আবার কেন এসেছেন? আর কাল যেন কি বলছিলেন আপনি নাকি আপনার স্বামীকে খুন করেছেন। কেন? আর আমার কাছে কি চাই আপনার?" মেয়েটি উত্তরে বলল "হ্যাঁ, করেছি তো। গলা টিপে খুন করেছি। আমার সাথে ঐ রকম করবে কেন?" শ্রেয়ান বলল "কি করেছে?" মেয়েটি বলল "প্রতিদিন রাত্রে মদ খেয়ে এসে আমায় মারতো। আবার লুকিয়ে একটা বিয়েও করেছিল। আর সেই মেয়ের সাথে হাত মিলিয়ে আমার খাবারে বিষ মিশিয়ে আমায় মেরে ফেলেছে। সবাইকে বলেছে আমি পাগল তাই বিষ খেয়ে আমি আত্মহত্যা করেছি। তাই বেঁচে থেকে যেটা করতে পারিনি সেটা মরে গিয়ে করেছি। প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি আর কোন ছেলেকে বিশ্বাস

করতাম না। কিন্তু অন্যদের থেকে আপনি অনেক আলাদা। সব শুনে শ্রেয়ান বলল "অনেক রাত হল, আপনি যান তো এবার। আমায় একটু ঘুমোতে দিন।" তাই শুনে মেয়েটি চলে গেল।

সেদিনের পর থেকে শ্রেয়ানের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে প্রতি রাতে মেয়েটির জন্যে অপেক্ষা করত। তার মা তার কাছে আসতে চাইলে সে তার মাকেও আসতে বারণ করে। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর শ্রেয়ান বুঝতে পারে সে মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু মেয়েটিকে বিয়ে করে সংসার করা সম্ভব নয়। তাই সে মেয়েটির দুনিয়াকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই কোন লাভ হয় না। আর সে মেয়েটিকে রোজ বলত আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমায় মুক্তি দাও।

এভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটার পর হঠাৎ একদিন শ্রেয়ান মোমবাতি নিভিয়ে মেয়েটির জন্যে অপেক্ষা করছে, পিছন থেকে কেউ যেন তার গলা টিপে ধরে।

পরের দিন সকালে শ্রেয়ানকে স্কুলে যেতে না দেখে ভূষণবাবু তার দরজায় কড়া নাড়েন। কিন্তু কেউ দরজা খোলে না। তাই দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখেন ঘরের মেঝেতে মৃতদেহ পড়ে আছে। গলায় পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ। কেউ যেন গলা টিপে হত্যা করেছে শ্রেয়ানকে .....।

"অতীত আমাদের ভিত্তি, বর্তমান আমাদের উপকরণ, ভবিষ্যৎ আমাদের লক্ষ্য ও সেটিই সিদ্ধি।"
– ঋষি অরবিন্দ।

প্রবন্ধ

এন.সি.সি.-র প্রশিক্ষণ : ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়

— অধ্যাপক রাতুল সাহা
(অর্থনীতি বিভাগ, সোনামুখী কলেজ)

গোড়ার কথা ঃ-

1942 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা 'ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং ক্যর' বলে যে বাহিনী তৈরি করেছিল, স্বাধীনতার পর সেই বাহিনীকেই দেশের উন্নয়ণ ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 1948 সালের 16 জুলাই ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল 'ন্যাশানাল ক্যাডেট ক্যর' আইন পাশ করেন এবং 1948 সাল থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে N.C.C. Unit খোলা হয়। 1965 থেকে 1971 সালের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় N.C.C.-র ভূমিকা তাদের সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্সের মর্যাদা দেয়। ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের পরেই অবশ্য N.C.C.-র সিলেবাসে গুরুত্ব পেতে শুরু করে সমাজসেবা, দেশের পুনর্গঠন ইত্যাদি। এন.সি.সি.-র মূল উদ্দেশ্য হল **একতা এবং অনুশাসন**।

–ঃ N.C.C.-র সংগঠন ঃ–

N.C.C.-তে মোট চারটি ডিভিশন আছে। স্কুল ছাত্রদের জন্য জুনিয়র ডিভিশন (J.D.) এবং কলেজ ছাত্রদের জন্য সিনিয়র ডিভিশন (S.D.)। অপর দুটি ডিভিশন হল স্কুলের ছাত্রীদের জন্য জুনিয়র উইং (J.W.) এবং কলেজের ছাত্রীদের জন্য সিনিয়র উইং (S.W.)। জুনিয়র ডিভিশনের একটি ইউনিটকে বলা হয় ট্রুপ এবং সিনিয়র ডিভিশনের একটি ইউনিটকে বলা হয় কোম্পানি। 160 জন ক্যাডেট নিয়ে একটি কোম্পানি তৈরি হয়।

–ঃ N.C.C.-র প্রশিক্ষণ ঃ–

N.C.C.-র প্রশিক্ষণ মানে নিয়মিত প্যারেড এবং বছরান্তরে সংগঠিত হওয়া নানা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করা। প্যারেডে শিখতে হয় ফ্রি হ্যান্ড, রাইফেল ড্রিল, ম্যাপ রিডিং। এছাড়া হয় থিওরিটিক্যাল ক্লাসও। পড়ানো হয় ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এবং জিওগ্রাফি, ইন্ডিয়ান মিলিটারি হিস্ট্রি, জেনারেল নলেজ, লিডারশিপ কোয়ালিটি অ্যান্ড ম্যান-ম্যানেজমেন্ট। 2013 সাল হতে N.C.C. তিন বছরের পাঠক্রম চালু হয়েছে।

–ঃ N.C.C. সার্টিফিকেট ঃ–

মোট তিন ধরণের সার্টিফিকেট N.C.C. তে দেওয়া হয়। স্কুল স্তরে 'A' সার্টিফিকেট। কলেজ স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'B' ও 'C' সার্টিফিকেট পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিরক্ষামন্ত্রক দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি সার্টিফিকেট-এর জন্য একসঙ্গে থিওরি ও প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। 'B' সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করলে তবেই 'C' সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। তবে 'A' সার্টিফিকেট পাশ না করলেও কলেজস্তরে 'B' সার্টিফিকেটের প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়।

–ঃ N.C.C.-র সুযোগ-সুবিধা ঃ–

N.C.C. তে ভর্তি হলে যে সমস্ত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) 'C' সার্টিফিকেট হোল্ডাররা শুধুমাত্র Interview এর মাধ্যমেই Army, Navy এবং Air Force-এ Commissioned Officer পদে যোগ দিতে পারে। তাদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয় না। তবে Degree Course-এ minimum 50% Marks থাকা আবশ্যক।

(২) ORs, Sailor, Airman এর চাকরিতে 5% থেকে 10% বোনাস Marks পাওয়া যায় এবং Military Force এ 2% থেকে 10% Bonus Marks পাওয়া যায়।

(৩) রাজ্য সরকারের ও বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির চাকরিতেও N.C.C. 'C' সার্টিফিকেট Holder দের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে।

(৪) Adventure Training এবং বিভিন্ন Sports-এ অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে Cadet দের বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

(৫) NCC Training এবং বিভিন্ন Camp-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব।

N.C.C. ও সোনামুখী কলেজ ঃ-

1986 সাল হতে শুরু করে প্রায় তিন দশক ধরে আমাদের কলেজে N.C.C. -র একটি ইউনিট (Coy No.5) চালু আছে। সেখানে প্রতি বছরে August মাসে 53 জন ছেলেমেয়েকে (SD = 36, SW = 17) উচ্চতা, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদি দেখে N.C.C. তে ভর্তি করা হয়।

এর ফলে কলেজের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের মাধ্যমে কলেজ এবং সমাজকে বিভিন্ন ভাবে উপকৃত করে আসছে। কলেজের ছেলে-মেয়েরা N.C.C. এর Training নিয়ে Army, Navy, Air Force, WBP, CISF, CRPF ইত্যাদি বিভিন্ন সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীতে চাকরি করছে। N.C.C. তে Training ও বিভিন্ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে ছেলে-মেয়েরা আত্মবিশ্বাসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সম্ভব হচ্ছে। N.C.C. ক্যাডেটদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা বা সাফল্য হল 26শে জানুয়ারি দিল্লিতে রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ। এই সাফল্য আমাদের কলেজের ক্যাডেটরা বেশ কয়েকবার অর্জন করতে পেরেছে। নীচে N.C.C. তে আমাদের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য তুলে ধরা হল :

ক্র.নং	নাম	রেজিমেন্ট নং	সাফল্য
১.	হারাধন ঘোষ	WB/SD/87/196903	26th Jan. 1989 তে দিল্লিতে রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ।
২.	আশিস পাল	WB/SD/92/255409	26th Jan. 1993 তে দিল্লিতে রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ এবং পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান।
৩.	স্বর্গীয় চিরঞ্জিত মণ্ডল	WB/SD/09/255687	2011 সালের 26 শে জানুয়ারিতে দিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ এবং 2013 সালে জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের সেনাবিভাগে কর্মরত অবস্থায় শহীদের মৃত্যুবরণ।
৪.	সাকীউল্লা মল্লিক	WB/SD/10/255731	2011 সালের মার্চ মাসে সারা ভারতের 4 জন N.C.C. Cadet দের মধ্যে 1 জন নির্বাচিত হয়ে দার্জিলিং-এ Himalayan Mountaineering Course-এ অংশগ্রহণ এবং Course শেষে Alfa(A) গ্রেড অর্জন।
৫.	সজল রায়	WB/SD/12/255348	27th Sept. 2013 থেকে 8th Oct. 2014 পর্যন্ত স্থল সৈনিক ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে অংশগ্রহণ।

সোনামুখী কলেজ ছাত্র-সংসদ : ২০১৪-১৫

সভাপতি – ডঃ বাপ্পাদিত্য মণ্ডল
সহ-সভাপতি – লোকনাথ লাহা
সাধারণ সম্পাদক – অতনু গরাই
সহ-সাধারণ সম্পাদক – মহাদেব মণ্ডল

ছাত্র কমনরুম উপসমিতি

যুগ্ম সম্পাদক – রিপন সেখ, সোমনাথ ঘোষ
যুগ্ম সহ-সম্পাদক – রাহুল দত্ত, বিশ্বজিৎ সিনহা
সদস্য – ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, কুন্তল ঘোষ, রাহুল আদক

ছাত্রী কমনরুম উপসমিতি

যুগ্ম সম্পাদিকা – সীমা পাল, ঝিলিক মুখার্জ্জী
যুগ্ম সহ-সম্পাদিকা – জুঁইরাণী শীট, দীপিকা ঘোষ
সদস্যা – লাবণী পরামাণিক, রুপা ঘোষ, মৌপিয়া রায়

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি (দিবা বিভাগ)

যুগ্ম সম্পাদক – বসিরুদ্দিন সেখ, দীপক কুমার খাঁ
যুগ্ম সহ-সম্পাদক – অরিন্দম পাল, অভিজিৎ জোয়ারদার
সদস্য – সেখ আমিরুল, বিপুল ঘোষ
সদস্যা – স্বর্ণালিকা রায়, দেবলীনা চ্যাটার্জী, পূর্বা ঘোষ
কোয়ল নায়েক, পূজা পাল

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি (প্রাতঃ বিভাগ)

যুগ্ম সম্পাদক – দীপক দাস, পার্থ সরকার
যুগ্ম সহ-সম্পাদক – জয় রক্ষিত, জ্যোতির্ময় ব্যানার্জ্জী
সদস্য – শান্তি দাস, কুশল ঘোষ
সদস্যা – বিউটি ঘোষ, মণিষা দত্ত, পূজা পাল।

পত্রিকা উপসমিতি

যুগ্ম সম্পাদক – কাশীনাথ পাঁজা ও পার্থ ঘোষ
যুগ্ম সহ-সম্পাদক – সৌভিক ঘোষাল, গৌতম ঘোষ
সদস্য – সাফিউল্লা মল্লিক, সেখ সাদ্দাম

সাংস্কৃতিক উপসমিতি

যুগ্ম সম্পাদক – কুন্তল ঘোষ, রুমকী দত্ত
যুগ্ম সহ-সম্পাদক – জয়প্রকাশ ব্যানার্জী, সাগর মুখার্জ্জী
সদস্য – সেখ কুতুবউদ্দিন মল্লিক, গিয়াসউদ্দিন সেখ,
মিলন ঘোষ

ক্রীড়া উপসমিতি

যুগ্ম সম্পাদক – অতনু দুয়ারী, প্রশান্ত সাহা
যুগ্ম সহ-সম্পাদক – পথিক ডাঙ্গর, সাজাহান সেখ,
মানস কুমার ভান্ডারী
সদস্য – অনুষ্টুপ কারক, তাপস রজক, প্রশান্ত নন্দী

বিজ্ঞান পরিষদ উপসমিতি

উপদেষ্টা – সুশোভন বিশ্বাস, রাজকুমার লোহার
যুগ্ম সম্পাদক – অভিষেক মুখার্জ্জী, অভিজিৎ দাস
জয়ন্ত সাহা
যুগ্ম সহ-সম্পাদক – দেবমাল্য দাস, কৃষ্ণদাস চন্দ্র
সদস্য – সুদীপ নাগ, সুমন দাস, ভাস্কর গোস্বামী
সুমিত কুমার দে

কলেজগত

(১) কলেজের প্রতিটি বিষয়ে ক্লাস করাতে হবে।
(২) কলেজের দোতলায় দু'পাশে বিল্ডিং করতে হবে।
(৩) কলেজের নিজস্ব ময়দানের ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) আগামী দিনে কলেজের Auditorium করতে হবে।
(৫) কলেজের চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে কলেজ সাজাতে হবে।
(৬) কলেজের Boys' Hostel করতে হবে।
(৭) কলেজের Girls' Hostel করতে হবে।

জেলাগত

(১) সোনামুখী শহরে বাইপাস করতে হবে।
(২) সোনামুখী শহরে বাসস্ট্যান্ড করতে হবে।
(৩) সোনামুখীকে যানজটমুক্ত করতে হবে।
(৪) সোনামুখী শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উন্নয়ন ঘটিয়ে চিকিৎসার মান উন্নত করতে হবে।
(৫) সোনামুখীতে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চালু করতে হবে।
(৬) জেলার খেলাধূলার মান উন্নত করতে হবে।
(৭) হাতির তাণ্ডব রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চল রক্ষা করতে হবে এবং গাছ লাগিয়ে বনাঞ্চল রক্ষা করতে হবে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

রাজ্যগত

(১) গরীব মানুষের ১০০ দিনের কাজ কেন্দ্রকে চালু রাখতে হবে।
(২) রাজ্যে শিল্পপতিদের বিনিয়োগের সুব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে।
(৩) Agriculture-এর ব্যবস্থা করে কৃষিতে আরো উন্নয়ন করতে হবে।
(৪) প্রতিটি ধর্মের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। গণতন্ত্রকে সম্মান জানিয়ে অসহিষ্ণুতাকে বর্জন করতে হবে।
(৫) রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেশের ১নং স্থানে পৌঁছে দিতে হবে।

ছাত্র-সংসদের সাফল্য

(১) কলেজের ২০১২-র শিক্ষাবর্ষে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার উন্নতি ও সুবিধার জন্য নতুন বই হয়েছে ৪,০০,০০০ টাকার।

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে Chemistry Honours চালু করা হয়েছে।

(৩) নতুন লাইব্রেরী তৈরীর কাজ চালু হয়েছে।

(৪) নতুন Boys' Toilet তৈরী হয়েছে।

(৫) কলেজের সামনে দুটি সুন্দর বাগান যা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

(৬) সমস্ত সাম্মানিক বিভাগে সিট সংখ্যা বড়ানো হয়েছে।

(৭) Physical Education ও Education Subject চালু হয়েছে।

(৮) কলেজের পঠন-পাঠন এবং ছাত্র-ছাত্রীর পরিষেবা উন্নত হচ্ছে।

(৯) কলেজের সামনে সাইকেল স্ট্যাণ্ড চালু।

(১০) কলেজ হেল্থ সেণ্টার চালু।

(১১) কলেজ নিরাপত্তা রক্ষী কর্মী দেওয়া হয়েছে।

(১২) কলেজে নতুন গেট তৈরী হয়েছে।

(১৩) কলেজে নতুন ক্যান্টিন চালু হয়েছে।

(১৪) কলেজের দোতলায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১৫) কলেজের মঞ্চ তৈরী হয়েছে।

(১৬) এ বছর নতুন Education Honours চালু করা হয়েছে।

(১৭) কলেজের ২০১৫-র শিক্ষাবর্ষে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার উন্নতি ও সুবিধার জন্য নতুন বই আনা হয়েছে প্রায় ৬,০০,০০০ টাকার মতো।

(১৮) নতুন CHEMISTRY ও ZOOLOGY Lab. চালু হয়েছে।

Bratachari Camp (Phy. Edn. Dept.)

Bratachari Camp (Phy. Edn. Dept.)

Saraswati Puja

Bratachari Camp (Phy. Edn. Dept.)

Bratachari Camp (Phy. Edn. Dept.)

NCC

Freshers' Day 2015

Freshers' Day 2015

Freshers' Day 2015

Freshers' Day 2015